সমাজ ও ধর্ম

মাহমুদা ইসলাম

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
প্রকাশন, মুদ্রণ ও বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রক
মুজীবুর রহমান
নুরাদ প্রেস
২৬, আবুল খায়রাত রোড, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ : মোহাম্মদ ইদ্রিস

প্রসঙ্গ-কথা

ব্যক্তিবিশেষের সংবেদনশীল মনের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। ধর্মের সঙ্গে মানুষের হৃদয়বৃত্তির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পারলৌকিক বিশ্বাস এবং পবিত্র আচার—এই দুটো উপাদানই সব ধর্মের মূলমন্ত্র। ধর্ম আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসার একটি আধ্যাত্মিক সমাধান দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষমাত্রেই সামাজিক জীব। স্বার্থের সংঘাত যখন আমাদের সামাজিক মূল্যবোধে আঘাত হানে তখন তার সমাধান ধর্মের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই ধর্মকে আমরা সামাজিক প্রয়োজনে প্রাধান্য দিতে পারি না। এজন্যই প্রয়োজন ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ-ব্যবস্থার। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ-ব্যবস্থায় এমন কতকগুলো মূল্যবোধ রয়েছে যা সকলের জন্যই গ্রহণযোগ্য। এর ফলে ব্যক্তি ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় তাই ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে আমরা দীর্ঘকাল ধর্মের নৃশংস রূপ প্রত্যক্ষ করেছি—হিন্দু মুসলমান উভয়ে উভয়কে নির্মমভাবে হত্যা করেছি—আবার মুসলমান হয়ে মুসলমানকে বর্বর পশুর ন্যায় হত্যা করেছি—সবই ধর্মের নামে। বাংলার মাটিতে তাই আর ধর্মের বাড়াবাড়ি নয়। ধর্ম চাই, তবে ধর্মান্ধতাকে মুছে ফেলতে হবে। ধর্মের হিংস্র শার্দূলকে খাঁচায় আবদ্ধ করতে না পারলে এদেশের কোন কল্যাণ নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বর্তমান গ্রন্থটি বিশেষ সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশের নতুন সামাজিক পরিবেশের মূল্যায়নে 'সমাজ ও ধর্ম' গ্রন্থটির অগ্রণী ভূমিকা সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী এবং সুধী পাঠকমণ্ডলীর আত্মবিশ্লেষণে যদি যথার্থভাবেই সাহায্য করে তাহলে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে গ্রন্থটির প্রকাশ সার্থক বলে মনে করবো।

বাংলা একাডেমী
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

মযহারুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

ভূমিকা

'সমাজ ও ধর্ম' মৌলিক রচনা নয়; ধর্মের সমাজতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও এটা নয়। প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানিগণ ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে যা বলে গেছেন, তার উপর ভিত্তি করে আমি ধর্মের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের একটা মোটামুটি ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি। যেসব গ্রন্থ থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার একটা তালিকা গ্রন্থ শেষে সংযোজিত হয়েছে। যাঁরা সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে বিশদ জানতে চান তারা এ সকল গ্রন্থ পড়ে উপকৃত হতে পারেন।

বাংলা ভাষায় এ ধরনের আলোচনার প্রধান প্রতিবন্ধক পরিভাষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগ থেকে একটা পরিভাষা-কোষ বের করবার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সর্বজনস্বীকৃত কোনও পরিভাষা নেই। আমি প্রধানতঃ বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত পরিভাষা ও সংসদ বাংলা অভিধানের উপর নির্ভর করেছি। তবে সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, এমন যেসব শব্দ ব্যবহার করেছি, তার ইংরেজী প্রতিশব্দ পেছনে দিয়ে দিয়েছি।

একটা কথা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন যে, সমাজ-বিজ্ঞানে ধর্মের আলোচনা ধর্ম-বিরোধী আলোচনা নয়। একটি ধর্ম বা সমগ্রভাবে ধর্ম সত্য কি ভ্রান্ত, সে সম্পর্কে সমাজ-বিজ্ঞানী কোনও রায় দেন না। একটি নির্দিষ্ট ধর্ম বা সমগ্র ধর্মের প্রতি তাঁর কোনও বিদ্বেষ নেই। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধর্মের রূপ কি, সংজ্ঞা কি এবং ধর্ম কি, ধর্মের সমাজ-বিজ্ঞান নিরপেক্ষভাবে তা বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করে এবং ধর্মের সঙ্গে সমাজ ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ ও মিথস্ক্রিয়া নির্দেশ করতে চেষ্টা করে। ধর্মের সামগ্রিক আলোচনায় সমাজ-বিজ্ঞানের কতিপয় বক্তব্য নির্দিষ্ট কোনও ধর্মমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না-ও হতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সমাজ-বিজ্ঞান মূলতঃ ধর্মের বিরোধী। ফলিত বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার ও বক্তব্য কিছু কিছু

ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞানকে ধর্মের পরিপন্থী বলে ছেঁটে ফেলা চলে না।

বরঞ্চ ধর্মের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা সকল ধর্মের প্রতি উদারতা ও সহিষ্ণুতার বিকাশে সহায়ক। আমাদের এই উপ-মহাদেশে ধর্ম নিয়ে অনেক হানাহানি হয়ে গেছে। ধর্মের নামে এদেশে ত্রিশ লক্ষ লোককে নির্বিচারে পশুর মত হত্যা করা হয়েছে। আজ স্বাধীন বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে তুলে ধরে ধর্মীয় বিভেদের মূল উৎপাটিত করে দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে কোনও ধারণা না থাকলে ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এতকাল আমাদের দেশে ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনা হতে পারেনি। ধর্মের সামগ্রিকরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বিস্তার লাভ করেছিল। যদি আমরা সমগ্র ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ, ধর্মের অত্যাবশ্যক ভূমিকা, সমাজের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য বন্ধন সম্পর্কে অবহিত হতাম তাহলে সকল ধর্মের প্রতি উদারতা ও সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হতে পারতো।

আজ স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ এসেছে। ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার এই সুযোগ যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাসী থেকেও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে; ধর্মীয় বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না, ধর্মের অপব্যবহারও সম্ভব হবে না।

পরিশেষে একটা কথা না বললে অন্যায় হবে। আমার শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ডক্টর নাজমুল করিম সাহেব সবসময় বাংলায় সমাজ-বিজ্ঞানের বই লেখার জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ তাঁর আগ্রহাতিশয্যেই আমি 'সমাজ ও ধর্ম' রচনায় ব্রতী হয়েছিলাম। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ এই বইটি প্রকাশের ভার নিয়েছেন। সেজন্য আমি তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

মাহমুদা ইসলাম

বিদিশা-কে

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম কি ?

ধর্ম অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষ নিয়ান-ডারথাল মানুষের ধর্ম ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও ধর্ম আছে।

কিন্তু বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন সমাজে ধর্ম এক নয়। কোনও ধর্ম এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কোনও ধর্মে দেবদেবীর সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। আবার অনেক ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বই নেই, শুধু ভূত-প্রেতকে কেন্দ্র করে ধর্ম গড়ে উঠেছে।

ধর্ম তা'হলে কি? ধর্মের মৌল উপাদান কি? ধর্ম যেমন প্রাচীন তার সংজ্ঞা দেওয়া তেমনি কঠিন। কারণ, ধর্ম একাধিক এবং এর সঙ্গে মানুষের হৃদয়বৃত্তির সম্পর্ক নিবিড়। নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মকে কেউ ধর্ম বলে মানতে চায় না। ধর্মের নামে মানুষ সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় ভাবাবেগ পরিহার করতে হবে এবং আধুনিক একেশ্বরবাদী ধর্ম এবং ভূত-প্রেত ও দেবদেবীর পূজা নিয়ে যে ধর্ম—উভয়কেই ধর্মের সংজ্ঞায় সমান স্থান দিতে হবে।

সকল ধর্মকে সমদৃষ্টিতে দেখে, ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গেলে তিন ধরনের সংজ্ঞার সন্ধান মেলে—যথা, মূল্যবোধ ভিত্তিক, বর্ণনামূলক এবং কার্মিক বা ক্রিয়াবাদী।

মূল্যবোধ ভিত্তিক সংজ্ঞায় ধর্ম কি হওয়া উচিত, তাই নির্দেশ করা হয়। এই ধরনের সংজ্ঞায় ধর্মকে একটা নির্দিষ্ট মূল্যবোধের ছাঁচে ফেলে যাচাই করা হয়। একথা বলা বাহুল্য যে, ধর্মের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনায়-মূল্যবোধ ভিত্তিক সংজ্ঞার স্থান নেই।

বর্ণনামূলক সংজ্ঞা কতিপয় বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতিকে ধর্ম বলে চিহ্নিত করে, কিন্তু বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতিগুলোর মূল্য যাচাই

করে না এবং তাদের কার্যকারিতা নির্দেশ করে না। এই ধরনের সংজ্ঞায় ধর্মের বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতিগুলোকে তুলে ধরা হয় এবং ধর্ম বাস্তবক্ষেত্রে কি, তাই বোঝানো হয়।

কামিক বা ক্রিয়াবাদী সংজ্ঞায় ধর্মকে তার কর্মের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয়, ধর্মের কাজ আলোচনা করে ধর্মকে বোঝানো হয়।

মূল্যবোধ ভিত্তিক সংজ্ঞা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কাজেই এ ধরনের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই।

বর্ণনামূলক সংজ্ঞা স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায় মূল্যবান। কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থায় তার গুরুত্ব কম। যে বিশ্বাস-আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ণনামূলক সংজ্ঞা ধর্মকে চিহ্নিত করে, পরিবর্তন-শীল সমাজ-ব্যবস্থায় তার রূপ বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মূল ভিত্তি না বদলালেও তার বাহ্যিক রূপ পরিবর্তিত হয়। কাজেই বর্ণনামূলক সংজ্ঞা পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থায় যথেষ্ট নয়।

তবে বিভিন্ন মনীষী ধর্মকে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের প্রয়াস সফলকাম না হলেও ধর্মের আলোচনায় এ-সব বর্ণনামূলক সংজ্ঞার গুরুত্ব কম নয়।

মনীষী ফ্রেজার ধর্ম নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তিনি ধর্ম বলতে বুঝেছেন, মানুষের চেয়ে উচ্চতর এমন এক শক্তির সন্তুষ্টি-বিধান, যে শক্তি মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। তাঁর মতে, ধর্মের মূল উপাদান দু'টি—এক, মানুষের চেয়ে উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস; আর অপরটি, সেই অতিমানবিক শক্তির আরাধনা।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ। অনেক ধর্মে জগদীশ্বরের ধারণা নেই। আদিম মানুষ মূর্তি পূজা করতো। প্রেতাত্মা, গাছ-গাছড়া, খাল-বিলকে পূজা করতো—কিন্তু জগদীশ্বর সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণা ছিল না। আধুনিক ধর্মগুলোর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নীরব।

ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী টেলার বলেছেন, ধর্ম মানে হচ্ছে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস। আদিম মানুষ মনে করতো যে, মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি। দেহ ও আত্মা—এই দুই মিলে জীবন। মৃত্যুতে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। মৃত্যু হলে দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা মরে না। আত্মা অবিনশ্বর। মৃত্যুর পরে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। মৃত্যু মানুষের বিদেহী আত্মাই প্রেতাত্মা। প্রেতাত্মা মনুষ্য-সমাজেই বিচরণ করে এবং কখনও মঙ্গল করে, আবার কখনও অমঙ্গল ডেকে আনে। মানুষের সুখ-দুঃখের জন্যে দায়ী এই প্রেতাত্মা, এক কথায় প্রেতাত্মা মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা। কেউ যদি ব্যাধিগ্রস্থ হয়, তার কারণ প্রেতাত্মা, ক্ষেতে যদি ফসল না হয়, সেই জন্যেও দায়ী প্রেতাত্মা। কাজেই প্রেতাত্মাকে খুশী রাখা দরকার। এদের সন্তুষ্ট করতে পারলে সুখস্বচ্ছন্দ লাভ সম্ভব। টেলারের মতে, আদিম মানুষের ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে আত্মার অবিনাশিতা ও প্রেতাত্মায় বিশ্বাস।

দার্শনিক টেলারের উপরোক্ত সংজ্ঞা সকল ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রাচীন হিব্রু ও আদিম সেমীয়দের ধর্মে আত্মার অবিনাশিতা ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। আধুনিক বৌদ্ধ ধর্ম আত্মার অবিনাশিতা অস্বীকার করে।

ফরাসী সমাজ-বিজ্ঞানী এমিল দুরখাইম ধর্মের অন্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মমত বিশ্লেষণ করে দুরখাইম দেখতে পান যে, ধর্মের মূল উপাদান দু'টি—বিশ্বাস এবং আচার। ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর বিশেষত্ব এই যে, সেগুলো বস্তু ও ভাববাদী জগতের মধ্যে দু'টি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীবিভাগ কল্পনা করে। দুরখাইম জগৎ-সংসারের এ দু'টি ভাগের নাম দিয়েছেন—পবিত্র এবং অপবিত্র। দেবদেবী, ঈশ্বর, প্রেতাত্মা, ভূত-প্রেত সবই পবিত্র জগতের অঙ্গ। অপবিত্র জগৎ হচ্ছে জীবিকার সন্ধানে পরিশ্রমী মানুষের দৈনন্দিন জীবন। এই দুই জগতের মধ্যে প্রভেদ চরম ও স্পষ্ট।

পবিত্র জগৎ ধর্মের জগৎ। পুরা কাহিনী, পৌরাণিক আখ্যান, উপকথা ও কিংবদন্তী সবই পবিত্র বস্তু বা শক্তির প্রকৃতি বা গুনাগুণের বিভিন্ন প্রকাশ ও উপস্থাপনা।

ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো এই পবিত্র জগৎ সম্পর্কে ধারণা ও অভিমত। আচার-পদ্ধতিগুলো পবিত্র জগতের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জন্য কতকগুলো অত্যাবশ্যক আচরণবিধি। পবিত্র জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার-পদ্ধতির সমষ্টি হচ্ছে ধর্ম। পবিত্র জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাসের বিভিন্নতা ধর্মের বিভিন্নতার কারণ।

এই সংজ্ঞাকে কিন্তু দুরখাইম যথেষ্ট মনে করেননি। কারণ, সংজ্ঞাটি ধর্ম ও যাদুবিদ্যা উভয়ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য। যাদুবিদ্যাতেও বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি আছে। কিন্তু দুরখাইমের মতে, ধর্ম ও যাদুবিদ্যা এক নয়।

দুরখাইমের মতে, ধর্ম বিশ্বাসগুলো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা জোটের সমষ্টিগত বিশ্বাস। সমগ্র জোট যৌথভাবে বিশ্বাসগুলোর প্রতি আস্থাশীল এবং সমবেতভাবে আচার-পদ্ধতিগুলো পালন করে থাকে। একটি সার্বজনীন বিশ্বাসের সূত্রে জোটের প্রত্যেকে একে অপরের সহিত গ্রথিত। যে জোটের সদস্যরা পবিত্র জগৎ সম্পর্কে একই বিশ্বাস পোষণ করে এবং একই আচার-পদ্ধতি পালন করে এবং এইসব বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতির মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকে, দুরখাইম সেই জোটকে বলেছেন চার্চ অর্থাৎ গির্জা। দুরখাইম বলেন, সব ধর্মেরই একটা গির্জা থাকে। ধর্ম একটা যৌথ প্রতিষ্ঠান, একটা সমষ্টিগত ব্যবস্থা। গির্জা ছাড়া ধর্ম হতে পারে না। এখানে যাদুবিদ্যার সাথে ধর্মের প্রভেদ।

যাদুবিদ্যায় চার্চ বা গির্জা নেই। যাদুকরের কোনও সমিতি বা জোট নেই। যাদুকর এবং যারা যাদুকরের কাছে নিজ প্রয়োজনে যায়, তাদের মধ্যে এমন বন্ধন নেই—যার দ্বারা তারা একতাবদ্ধ হতে পারে। যাদুকর এবং তার অনুসারীদের কোনও সমষ্টিগত জোট হিসাবে গণ্য করা চলে না। ধর্মের সকল অনুসারীকে নিয়ে একটা সম্প্রদায়, একটা গির্জা। তাদের বিশ্বাস এক, আচার-পদ্ধতি এক। যাদুকর এবং তার অনুসারীদের নিয়ে কোনও সম্প্রদায় বা গির্জা গড়ে ওঠে না।

তা'হলে আমরা ধর্মের একটা পরিপূর্ণ সংজ্ঞা পাচ্ছি। ধর্ম পবিত্র জগৎ সম্পর্কে কতিপয় বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি অনুসারীদের একটি সুসম্বদ্ধ নৈতিক সম্প্রদায়ে একতাবদ্ধ করে।

একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, দুরখাইমের সংজ্ঞা একপেশে। তিনি ধর্মকে সমষ্টির ব্যাপার বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ব্যাষ্টির সম্পর্ক তিনি অবজ্ঞা করেছেন। ধর্মকে শুধু সমষ্টিগত ব্যাপার বলা চলে না। ব্যক্তি পৃথক পৃথকভাবে এবং নির্জনে একাকী ধর্মের অভিজ্ঞতা অনুভব করতে পারে এবং করে থাকে। আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতিকে ঠিক গির্জার মর্যাদা দেওয়া চলে না। বস্তুতঃ কোনও জোটের অস্তিত্ব ছাড়াই আদিম মানুষ ধর্মকে অনুভব করত। সামাজিক ছাড়াও ধর্মের একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। ধর্মের এই মনস্তাত্ত্বিক দিককে দুরখাইম সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন।

তাছাড়া, তিনি ধর্ম ও যাদুবিদ্যার মধ্যে যে প্রভেদ নির্দেশ করেছেন, তা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যাদুবিদ্যার প্রভাব সুস্পষ্ট।

আমরা ধর্মের তিনটি সংজ্ঞা পেলাম। এর কোনটিই নিখুঁত নয়। তবে সবগুলো সংজ্ঞার মধ্যে একটি মূল সুর ধ্বনিত হচ্ছে। ফ্রেজারের পরমেশ্বর, টেলারের প্রেতাত্মা, দুরখাইমের পবিত্র শ্রেণী—কোনটিই পার্থিব নয়, মনুষ্যলোকের অতীত অলৌকিক কোনও শক্তি। পার্থিব সাধারণ জগৎ ছাড়া একটি লোকাতীত জগৎ রয়েছে, যাকে প্রাকৃতিক বলা চলে না, যা প্রাকৃতিকের উর্ধে, প্রাকৃতিকের চেয়ে উচ্চতর। সমাজ-বিজ্ঞানী মেরেট একে বলেছেন 'অতিপ্রাকৃত'।

প্রাকৃতিক জগৎ গতানুগতিক, পার্থিব ও দৈনন্দিন জগৎ. এই স্বাভাবিক জগৎকে ছাড়িয়ে অতিপ্রাকৃত জগৎ। যা 'লোকাতীত, যা অসাধারণ, যা স্বভাবসিদ্ধ নয়, যা সচরাচর ঘটে না বা দেখা যায় না, তাই অতিপ্রাকৃত। প্রচলিত নিয়ম-শৃংখলার নিগড়ে অতিপ্রাকৃতকে ধরা যায় না।

প্রাকৃতিককে আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাভাবিক, সাধারণ ও অতি পরিচিতরূপে গ্রহণ করি। সুতরাং প্রাকৃতিক জগৎ আমাদের চেনা ও জানা জগৎ। কিন্তু অতিপ্রাকৃত আমাদের অচেনা, অজানা এবং দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ঢাকা। অতিপ্রাকৃতকে তাই আমরা দেখি ভীতি ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। ফলে মানুষ বিচার-বুদ্ধিকে পেছনে ফেলে, তার সংবেদশীল মন ও ভাবময় অনুভূতিকে আশ্রয় করে এই অজানা জগৎকে জানতে ও বুঝতে চেয়েছে। মানুষ কখনও কল্পনা করেছে একটা ঐশ্বরিক শক্তি, কখনও কল্পনা করেছে মৃত পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার শক্তি, কখনও কল্পনা করেছে একটা নৈর্ব্যক্তিক অবোধ্য মহাকালের শক্তিকে।

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসীদের মনোভাব ও আচরণ—এই নিয়েই ধর্ম।

প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতের প্রভেদের ভিত্তিতে ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করার বিপদ এই যে, ধর্ম জীবনের একটি পৃথকভাগ হিসাবে পরিগণিত হয়; মনে হয় আমাদের চেনা ও জানা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যেন ধর্মের কোনও যোগ নেই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গ এবং আমাদের প্রতিদিনের কর্মমুখর জীবনের সঙ্গে ধর্ম নানাভাবে জড়িত। কাজেই জীবনকে বিশেষ কোন ভাগে ভাগ করে ধর্মকে বোঝা সম্ভব নয়।

ধর্মের আমরা যে কয়টি বর্ণনামূলক সংজ্ঞা পেলাম তার কোনটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এবারে দেখা যাক, ধর্মের কামিক সংজ্ঞা কতটা যুক্তিযুক্ত।

ধর্মের প্রথম কামিক সংজ্ঞা দিয়েছেন সমাজ-বিজ্ঞানী ম্যালিনওস্কী। তাঁকে অনুসরণ করে পরে অন্যান্য মনীষী ধর্মকে কর্মের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। ধর্মের কাজ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ, ধর্ম আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান দিতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞান আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, সকল সমস্যার সমাধান দেওয়াও বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের জ্ঞানের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে

যে সব প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে এবং যে সব সমাস্যার সমাধান করতে বিজ্ঞান অকৃতকার্য হয়েছে, ধর্ম সেগুলোকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম ব্যক্তিগত আচরণ এবং সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে কতিপয় মৌলিক বিধি-ব্যবস্থা, মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যকে সদাচার বলে নিতিত করে এবং সেগুলোকে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন, মানুষের যৌন-জীবন, পরিবার, সম্পত্তির মালিকানা, সামাজিক শ্রেণীবিভাগ, নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমঝোতা সম্পর্কে ধর্ম কতকগুলো নির্দেশ এবং বিধান দেয় এবং সেগুলো যাতে প্রতিপালিত হয়, তার ব্যবস্থা করে।

শুরুতেই বলা প্রয়োজন যে, কার্মিক সংজ্ঞার কয়েকটি অসুবিধা আছে। কর্মের মাধ্যমে ধর্মকে চিহ্নিত করতে গিয়ে মূল্যবোধের প্রশ্ন এসে যেতে পারে। কতকগুলো কর্মকে যদি ধর্মের কর্মরূপে নির্দিষ্ট করা হয়, তা হলে ঐ কর্ম সম্পাদন করতে কৃতকার্য হয় এমন বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতিই কেবল ধর্ম বলে স্বীকৃতি পাবে এবং যে বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে ব্যর্থ হবে, তা ধর্ম বলে স্বীকৃত হবে না। বিজ্ঞান-সম্মত সংজ্ঞায় এই অসুবিধা দূর করতে হবে। ধর্ম কতকগুলো কর্ম সম্পাদন করে এই কথা না বলে, যদি বলি যে, ধর্ম কতকগুলো নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করতে প্রয়াস পায়, তা হলে ধর্ম কর্তব্যকার্যে সফলকাম হলো কি বিফল হলো, সে প্রশ্ন ওঠে না। যে বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি নির্দিষ্ট কর্ম করতে চেষ্টা করে, তাই ধর্ম। কর্মগুলো সম্পাদনে সফলকাম হতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা যখন বলি যে, ধর্ম আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান দেয়, তখন আমরা এ কথা বোঝাতে চাই যে, ধর্ম জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান দিতে চেষ্টা করে। সে চেষ্টা সফল হলো না বিফল হলো, তার মূল্যায়ণের উপর ধর্মের সংজ্ঞা নির্ভর করে না।

কার্মিক সংজ্ঞা দিতে গেলে ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রভেদ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে হবে। ধর্মকে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করার

উপায় কি? উপায় হচ্ছে, শুধু সেই সকল কর্মকে ধর্মের কর্মরূপে নির্দেশ করা, যা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান সমপাদন করতে পারে না।

ধর্মের সে কর্মগুলো কি, যা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান সমপাদন করতে পারে না এবং যার দ্বারা ধর্মকে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক করা চলে?

ব্যক্তি ও সমাজের চরম সমস্যাগুলো নিয়ে ধর্মের কাজ। ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে সমাধান করা যায় না, জীবনের এমন চরম সমস্যা কি? এ সমস্যাগুলো নানাবিধ—যেমন, অস্তিত্বের সমস্যা—জীবন ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গূঢ় অর্থ কি? শক্তির সমস্যা—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পেছনে কোন্ গতিশীল শক্তি কাজ করে? ভবিতব্যের সমস্যা—সুখ ও দুঃখ আশা ও নিরাশা, প্রাপ্তি ও হতাশার কার্যকারণ কি? বাঁচামরার সমস্যা—মানুষ জন্মায় কেন আর মরেই বা কেন? মৃত্যুর পরে কি হয়। এ সকল সমস্যা প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। এসব সমস্যা মূলতঃ মানসিক সমস্যা এবং ব্যক্তি হিসাবে ও সমাজের সদস্য হিসাবে যন্ত্রণা ও হতাশা মানুষকে পীড়া দেয়। এমন কোন ব্যক্তি বা সমাজ নেই, যে ব্যক্তি বা সমাজ এই মানসিক সমস্যা অনুভব না করে। আমরা প্রিয়জনের মৃত্যু দেখছি; বাসনার অপূর্ণতাজনিত হতাশা আমাদের দুঃখিত ও নিরানন্দ করে তুলছে, পরস্পরের মধ্যে সংঘাত, স্বার্থের ও সামাজিক মূল্যবোধের সংঘাত আমাদের মনকে ত্রস্ত ও হতবাক করে তুলছে। এসব মানসিক সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়ে ব্যক্তি ও সমাজের অনুভূতিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কিন্তু মানুষের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষ কোনও ব্যবস্থা এসব মানসিক সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। জীবন ও মৃত্যুর বেদনাদায়ক রহস্যের কিনারা করতে পারেনি।

জ্ঞানের যেখানে শেষ, ধর্মের সেখানে শুরু। বিজ্ঞান যা পারেনি ধর্ম মানুষের জন্য সে কর্ম সাধন করে। ধর্ম জীবন ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করে। মত্যুর সমস্যা, হতাশা, যন্ত্রণা ও সংঘাতের সমস্যার সমাধান দেয়। ধর্ম মানুষকে দুঃখ দৈন্য, ব্যথা-বেদনা, হতাশা

ও নিরাশার দুঃসহ ভার বহণ করার মনোবল দেয় এবং উপায়হীন মানুষকে বিশ্বাসের অবলম্বন দিয়ে জগৎ-সমুদ্রে পাড়ি জমাতে সাহায্য করে। মৃত্যুতে শেষ নয়,—এরপরও জীবন আছে, সে জীবন আদি অন্তহীন; দুঃখ-বেদনা, হতাশা অর্থহীন নয়, সকল দুঃখের শেষে অনন্ত সুখের সাগর বিস্তৃত। ধর্ম মৃত্যুপথ যাত্রীকে মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনের লোভ দেখায়। যখন সব সহায়-সম্বল শেষ হয়ে যায়, ধর্ম তখন মানুষের সামনে আশার বর্তিকা জ্বেলে দেয়।

ধর্ম তাহলে, এমন একটা ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা মানুষের সেসব চরম সমস্যার মোকাবিলা করতে চেষ্টা করে, যে সব সমস্যা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়।

ধর্ম বলে চিহ্নিত সকল ব্যবস্থার মূল উপাদান দু'টি, একটি তত্ত্বীয়, ধর্ম কতকগুলো বিশ্বাসের সমষ্টি। আর একটি ব্যবহারিক—ধর্ম কতকগুলো আচার-পদ্ধতি ও সামাজিক সম্পর্কের সমষ্টি। আধুনিক সভ্য-জগতে প্রচলিত ধর্মগুলোতে বিশ্বাসই প্রধান কিন্তু আদিম মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় বিশ্বাসের চেয়ে আচার-পদ্ধতির ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম সমাজ ও ধর্ম

আদিম কথাটার মধ্যে তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। লোক মুখে শব্দটি বর্বর ও অসভ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আদিম মানুষ অসভ্য বা বর্বর ছিলো না। তার নিজস্ব কৃষ্টি ছিল। সমসাময়িক পরিবেশে আদিম মানুষ যে কৃষ্টি গড়ে তুলেছিল, আধুনিক সভ্যতার বিকাশে তার অবদান নগণ্য নয়। তাই অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী আদিম শব্দটি পরিহার করেন। কেউ বলেন, প্রাক্-শিক্ষিত সমাজ, কেউ বলেন শিক্ষিত—নয়—সমাজ।

আমরা আদিম সমাজ কথাটা ব্যবহার করব। কিন্তু তার অর্থ সম্পর্কে সচেতন থেকেই শব্দটি ব্যবহার করব। আদিম মানুষের নিজস্ব কৃষ্টি এবং তার সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ তার ধর্ম। সকল আদিম সমাজেই ধর্ম ছিল।

তবে আদিম ধর্মে বিশ্বাসের চেয়ে আচার-পদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপের ভূমিকা প্রধান। আচার-পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝি, ধর্ম-কর্ম সম্পাদনের নির্দিষ্ট রীতিনীতি। এই রীতি হতে পারে উপাসনা, পবিত্র সঙ্গীত, কীর্তন, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নৃত্য-নিবেদন, বলিদান ও নৈবেদ্য-প্রদান। সকল আচার-পদ্ধতির উদ্দেশ্য, দুজ্ঞেয় ও ভীতিপ্রদ অতিপ্রাকৃত শক্তির তুষ্টি বিধান। আদিম মানুষ অতি প্রাকৃত শক্তিতে মানবিক স্বভাব ও দোষগুণ আরোপ করত। মানুষের মতই উপাসনা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তাদের দয়ার উদ্রেক করা যায়। মানুষের মতই তারা তোষামোদে অনুগৃহীত হয়। তারা রুষ্ট ও কুপিত হলে তাদের নৃত্যগীত, বলিদান ও নৈবেদ্য-প্রদানের দ্বারা ভোলানো যায়।

আদিম মানুষের আচার-পদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ বলিদান এবং নৈবেদ্য-নিবেদন। আদিম ধর্মে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। আফ্রিকার উগাণ্ডার দলপতির পুত্র-সন্তান জন্মালে, তাকে দেবতার উদ্দেশ্যে হত্যা করা হতো। আফ্রিকার অধিকাংশ আদিবাসী সমাজে নরবলি প্রথা ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-হিসাবে গণ্য হতো। প্যালেষ্টাইনে ইসরাইলী অধিকার স্থাপিত হওয়ার আগে শিশু-সন্তানকে দেবতার পীঠে বলি দেওয়া হতো। ভারতবর্ষে নাগাদের মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত নরবলি প্রথা চালু ছিল। নিকট অতীত পর্যন্ত আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার আদিবাসী সমাজে রাজাকে বলিদানের নিয়ম ছিল। রাজার রাজত্বকাল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। এই নির্দিষ্ট রাজত্বকাল অতিবাহিত হলে, রাজাকে আনুষ্ঠানিকভাবে হত্যা করা হতো। যে সমাজে রাজার রাজত্বকাল নির্দিষ্ট ছিল না, সেখানে রাজা বৃদ্ধ হলে কিংবা কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে, তাকে হত্যা করা হতো। পরবর্তীকালে অনেক সমাজে রাজাকে হত্যা না করে তার বদলে অন্য কাউকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত হয়। মেক্সিকোর এজটেক সমাজে একটি সুস্থ সবল বন্দী যুবককে কৃত্রিম রাজা বলে হাজির করা হত এবং এক বছর এই কৃত্রিম রাজা আসল রাজার বদলে রাজত্ব করত। বছর শেষ হয়ে গেলে আসল রাজার বদলে এই নকল রাজাকে বলি দেওয়া হতো। তবে সভ্যতার বিকাশের ফলে নরবলি প্রথা প্রায় লোপ পেয়েছে এবং পশুবলি প্রথা তার স্থান গ্রহণ করেছে।

দেবতার উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য এবং ফলমূল নিবেদন প্রায় সব আদিম ধর্মেই প্রচলিত রীতি। নতুন শস্য উঠলে, নিজেরা না খেয়ে প্রথমে সেই শস্য দেবতাকে নিবেদন করা হয়। দেবতা নৈবেদ্য গ্রহণ করলে পুরোহিত দেবতার পরিতৃপ্তির কথা ঘোষণা করে। তখন সবাই সেই নতুন শস্য ভোজন করে। মেক্সিকোর এজটেক উপজাতি বীট ও ভুট্টা দিয়ে দেবতার বিগ্রহ বানিয়ে পূজা করে। পূজার শেষে পুরোহিত বিগ্রহটিকে ভেঙে উপজাতির সকল সদস্যের মধ্যে বীট ও ভুট্টা ভাগ করে দেয় এবং সবাই মিলে তা আহার করে।

বলিদান ও নৈবেদ্য-নিবেদন দু'টি উদ্দেশ্য সাধন করে—দেবতার ক্ষুধা ও বাসনা পরিতৃপ্ত হয় এবং পূজারীর দেবতায় বিশ্বাস প্রমাণিত হয়।

নানা লক্ষ্যে-উপলক্ষ্যে আদিম মানুষ আচার-পদ্ধতি পালন করত। ব্যক্তির জীবনে প্রধান প্রধান উপলক্ষ্য ছিল সন্তানের জন্ম, সন্তানের নামকরণ, বয়ঃসন্ধি, বিবাহ, ব্যাধি ও মৃত্যু। প্রত্যেক উপলক্ষ্যের জন্য নির্দিষ্ট আচার-পদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপ ছিল। ব্যক্তি ছাড়াও, গোষ্ঠি অর্থাৎ গোত্র ও উপজাতির জীবনের কতকগুলো উপলক্ষ্যে আচার-পদ্ধতি অনুসৃত হতো। যেমন অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি, মহামারী মড়ক, শিকার ও মাছ ধরার উপলক্ষ্যে।

আদিম মানুষের আচার-পদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য তার গোষ্ঠি চরিত্র। গোত্র বা উপজাতি যৌথ ও সমবেতভাবে ক্রিয়াকর্ম ও আচার-পদ্ধতি পালন করে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠি জীবনের বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আচার-পদ্ধতি অনুসৃত হয় সাধারণ্যে, গোত্র ও উপজাতির সকল সদস্য তাতে অংশ গ্রহণ করে। ব্যক্তির জীবনের উপলক্ষ্যে হোক, কিংবা গোত্রের জীবনের উপলক্ষ্যে হোক, আচার-অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় প্রকাশ্যে, সাধারণ্যে এবং সমবেতভাবে। কি উপাসনা, কি সঙ্গীতকীর্তন কি নৃত্যগীত, কি বলিদান, কি নৈবেদ্য-নিবেদন সকল আচার-পদ্ধতিতেই গোত্র বা উপজাতির সকল সদস্য যৌথভাবে অংশ গ্রহণ করে। প্রাচুর্যের দিনে, বাৎসরিক বা পর্যায়ক্রমিক ভোজ উৎসবে, নবান্নে এবং শিকার ও মাছ ধরার ঋতুতে ধর্মানুষ্ঠানের যৌথ-চরিত্র পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। এ-সব উপলক্ষ্যে গোত্রের সকল সদস্য দলে ভারী হয়ে পরস্পরে মেলামেশা, খানাপিনা ও নাচগানে মুখর হয়ে ওঠে।

আদিম মানুষের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো গোত্রের যৌথ অনুষ্ঠান। প্রত্যেক ধর্মই একেকটি গোত্রের ধর্ম। সমাজ হিসাবে গোত্র বা উপজাতি তার ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন। ফলে আদিম সমাজে গোত্র বা উপজাতির মধ্যে ধর্ম নিয়ে বিভেদ বা দ্বিমতের অবকাশ নেই।

আদিম ধর্মের গোত্র-চরিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আদিম ধর্ম মূলতঃ ব্যক্তির ব্যাপার নয়—গোষ্ঠির যৌথ ব্যাপার। ফরাসী সমাজ বিজ্ঞানী এমিল দুরখাইম অষ্ট্রেলীয় অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আদিম ধর্ম সর্বতোভাবে সামাজিক ব্যাপার, ব্যক্তি পৃথক পৃথকভাবে ধর্মকে উপলব্ধি করে না, গোত্রের সদস্য হিসাবে ধর্মকে অনুভব করে।

দুরখাইম অষ্ট্রেলীয় উপজাতিদের সমাজ-জীবনে দুটি ভাগের সন্ধান পায়—একটি আর্থিক আর একটি আনুষ্ঠানিক। আর্থিক ভাগ হচ্ছে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পরিশ্রমের জীবন। প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ ভরণ-পোষণের জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় নিরানন্দ ও বৈচিত্র্যময় কর্মে ব্যাপৃত থাকে। এই গতানুগতিকতার হাত থেকে সাময়িক পরিত্রাণের জন্য গোত্রের সকল সদস্য বছরের কয়েকটি উপলক্ষ্যে ধর্মস্থানে সমবেত হয়ে আচার-পদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে—নৃত্যগীত, সঙ্গীত ও আত্মোৎসর্গের অনুপ্রেরণায় তারা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং এই ভাবময় পরিবেশে তাদের মনে ধর্মের অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। বস্তুতঃ, গোত্রই তাদের মধ্যে ধর্মের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং তাদের কাছে গোত্রই ঈশ্বর বলে প্রতীয়মান হয়।

একথা সত্য যে, আদিম ধর্মে গোত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এবং প্রায় সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানই যৌথভাবে সাধারণ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু গোত্রের এই প্রাধান্য নিয়ে দুরখাইম একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। আদিম ধর্মে গোত্রের প্রাধান্য স্বীকার করে নিলেও ব্যক্তির অস্তিত্বকে একদম অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তি নিজস্বভাবে নির্জনে ধর্মের অনুভূতি লাভ করতে পারে না, একথা সত্য নয়।

যখন কোন যুবককে ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়, তখন অনেকগুলো আচার-পদ্ধতি পালন করা হয়ে থাকে। এইসব ক্রিয়া, কর্ম ও আচার সাধারণ্যে যৌথভাবেই অনুষ্ঠিত হয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আচার-পদ্ধতির একটি অঙ্গ দীক্ষা গ্রহণকারীর নির্জনবাস। দীক্ষা গ্রহণকারীর নির্জনবাসকে যৌথ অনুষ্ঠান বলা চলে না। তাছাড়া, দীক্ষা গ্রহণকারীকে

ব্যক্তিগতভাবে কতকগুলো কষ্টবরণ করে নিতে হয়। এর মধ্যে দৈহিক কষ্টও অন্তর্ভূক্ত। দীক্ষা গ্রহণকারীর এই ব্যক্তিগত অনুভূতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।

দূরখাইম ধর্মকে গোত্রের সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। কিন্তু গোত্র ধর্মের চেয়ে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান। গোত্র যুগে যুগে প্রথা ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। গোত্রের প্রথা ও ঐতিহ্য আংশিক ধর্মীয় ও আংশিক ধর্মনিরপেক্ষ। কৃষিজীবী সমাজে কি করে কৃষি কাজ করতে হয়, কৃষির জন্য কি কি যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, কখন বীজ বুনতে হয়, হাল চষতে হয়, নিড়াতে হয়, ফসল কাটতে হয়, পোকা লাগলে কি করতে হয়, এ সকল ব্যাপারে প্রত্যেক সমাজে প্রয়োজন মাফিক প্রথা ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু এইসব প্রথা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই। এগুলো ধর্মনিরপেক্ষ।

দূরখাইম বলেন, গোত্রের সমবেত নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে ধর্মের অনুভূতি জাগে। কিন্তু তিনি খেয়াল করেননি যে, সমবেত নৃত্যগীত ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে। ফসল কাটার সময় বা ভূমিকর্ষণের সময় পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব ও মনের স্ফূর্তি বজায় রাখার জন্য সকল আদিম সমাজে নৃত্যগীতের প্রচলন আছে। এই ধরনের নাচ-গান থেকে ধর্মের অনুভূতি সৃষ্টি হয় না।

কাজেই গোত্র ও ধর্ম এক নয়। তবে গোত্রের বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতিতে ধর্মের বিশিষ্ট স্থান আছে। আদিম ধর্মের গোত্র চরিত্রের কারণ খুঁজে বের করা শক্ত নয়। প্রথমতঃ, দুর্জ্ঞেয় ও ভীতিপ্রদ অতিপ্রাকৃত শক্তির মোকাবিলায় সামাজিক সহযোগিতা অপরিহার্য। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সন্ধিক্ষণগুলোতে, যেমন মৃত্যু, ব্যাধি, বিবাহ, অনাবৃষ্টি, মন্বন্তরে যৌথ ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশ্বাসের একতা দেয় এবং বিপদাপন্ন ব্যক্তি ও সমাজকে ভেঙে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

দ্বিতীয়তঃ, আদিম সমাজের নৈতিক মূল্যবোধকে বজায় রাখার জন্য আচার-পদ্ধতির প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। যে কোনও নৈতিক বিধি-ব্যবস্থাকে স্থায়ী রাখতে হলে তাকে সার্বজনীন হতে হবে এবং

সকলকে সেই মূল্যবোধ গ্রহণ করতে হবে। আদিম সমাজে কোনও বিধিবদ্ধ আইন-ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই নৈতিক মূল্যবোধকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে এবং সাধারণ্যে ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর প্রতিপালন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক সমাজের কতকগুলো পবিত্র প্রথা ও ঐতিহ্য থাকে। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, কিন্তু সমাজ পুরুষানুক্রমে এইসব প্রথা ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখে। কাজেই সমাজের জন্য এই প্রথা ও ঐতিহ্য রক্ষা করা আবশ্যক। এটা করতে হলে সমাজের প্রত্যেককে ঐ প্রথা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে। ঐ প্রথা ও ঐতিহ্যকে আবার যথাযথভাবে পরবর্তী পুরুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আদিম সমাজের পক্ষে প্রথা ও ঐতিহ্যকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না; শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে এগুলোকে নির্ভুলভাবে জিইয়ে রাখতে হতো। যৌথ আচার-অনুষ্ঠানের ফলে একদিকে প্রথা ও ঐতিহ্যের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ঘোষিত হতো; অপরদিকে বহুলোকের মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ায় ফলে এগুলো মনে রাখা সম্ভব হতো। কাজেই একমাত্র যৌথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ধর্মীয় প্রথা ও ঐতিহ্য নির্ভুলভাবে পুরুষানুক্রমে লোকমুখে সংরক্ষিত হতে পারত। মোটকথা, যৌথ অনুষ্ঠান ছিল ধর্মীয় প্রথা ও ঐতিহ্যের একমাত্র রক্ষা-কবচ।

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মের উৎপত্তি

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম কোন সমাজে কিভাবে ধর্মের উদ্ভব হয়, তা জানা সম্ভব নয়। কারণ আমরা যে সব আদিম সমাজে ধর্মের অস্তিত্ব পাই, সে সব আদিম সমাজও সহস্র বৎসর ধরে জগতে বর্তমান রয়েছে এবং হাজার হাজার বছর আগে তাদের মধ্যে ধর্মের উন্মেষ হয়েছে। এ সব সমাজ এমন ইতিহাস রেখে যায়নি, যা থেকে ধর্মের উৎপত্তির ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ধর্মের উদ্ভব কি করে হলো, তা কতকটা অনুমান করে নিতে হয়। নৃতাত্ত্বিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীরা যৎসামান্য প্রত্নতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণাদির সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অনুমান মিশিয়ে ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে মোটামুটি মতবাদ দিতে চেয়েছেন।

এইসব মতবাদ খুব একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মত-বিরোধের অবকাশ আছে এবং কোনও একটি মতকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একদল জোর দিয়েছেন ধর্মের রহস্যময় ও ভীতিপ্রদ রূপের উপর। এদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা হচ্ছেন বিজ্ঞানী টেলার। টেলারের মতবাদকে বলা হয় সর্বপ্রাণবাদ। আর একটি মতবাদ দিয়েছেন মেরেট, যাকে বলা যেতে পারে মহাপ্রাণবাদ। এ অধ্যায়ে আমরা এই দুটি মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব।

এ দু'জন মনীষী ছাড়া আর একজন মনীষী ধর্মের এই রহস্যময়তার মধ্যে তার উৎপত্তির কারণ খুঁজেছেন। তিনি বিশ্ববিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ

ফে্রজার। ফে্রজারের মত বুঝতে হলে যাদুবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা যাদুবিদ্যা এবং তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক আলোচনা করব।

দ্বিতীয় দল জোর দিয়েছেন মানুষের সংবেদনশীল মনের প্রয়োজনের উপর। মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড বলেছেন, পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের উৎপত্তির মৌলিক কারণ নিহিত আছে। শিশুর মনে পিতার প্রতি যুগপৎ ভীতি ও অনুরক্তি দেখা যায়। এক দিকে শিশু যেমন পিতার কর্তৃত্বকে ভয় করে, অপর দিকে তেমনি পিতার প্রতি তার স্নেহজনিত অনুরাগ থাকে। পিতার প্রতি মনোভাব থেকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা জন্মে। পিতার প্রতি শিশুর মনোভাবই রূপান্তরিত হয় ঈশ্বরের কল্পনায়। পিতার মহত্তর প্রতিচ্ছবিই ঈশ্বর। পিতার মত ঈশ্বরের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব মানুষ পদে পদে অনুভব করে। আবার পিতার মত ঈশ্বর করুণাময় এবং স্নেহশীল। মোটকথা, ঈশ্বর পিতার নামান্তর। পিতার সঙ্গে ঈশ্বরের সাদৃশ্য থেকে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের যুগপৎ ভীতি ও অনুরক্তি জন্মায়।

পলরোদিনের মত, ধর্মের জন্ম মানুষের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার অনুভূতি থেকে। আদিম মানুষ সুখ চাইতো, তার মনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা ছিল; কিন্তু তার পারিপার্শ্বিকের অশুভ ও বিরুদ্ধ শক্তিগুলো ছিল প্রবল এবং তার জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ; বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান ছিল নগণ্য। এই স্বল্প জ্ঞান নিয়ে তার পক্ষে পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধ শক্তিগুলোকে মোকাবিলা করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। ফলে মানুষ নিজেকে দুর্বল ও অসহায় ভাবতো। তার মনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা মানসিক শান্তি কোনটাই ছিল না। এই অক্ষমতা ও তুচ্ছতার মনোভাব-প্রসূত অনিরাপত্তা ও অশান্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে আদিম মানুষ দুর্জ্ঞেয় ও ভীতিপ্রদ অতিপ্রাকৃত শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সংবেদনশীল মনের প্রতিক্রিয়া থেকেই ধর্মের উৎপত্তি।

ফ্রয়েড ও রোদিনের মতবাদকে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু ধর্মকে সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে, এ মতবাদগুলোর

সংকীর্ণতা ধরা পড়ে। ধর্ম শুধু ব্যক্তির মনের ব্যাপার নয়; সামাজিক ব্যাপারও বটে। ব্যক্তি ও সমাজের সাথে ধর্মের সম্পর্ক এত ব্যাপক ও বহুধা বিস্তৃত যে, শুধুমাত্র মানসিক কারণ দেখিয়ে ধর্মের উদ্ভব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে তৃতীয় অভিমতটি দিয়েছেন দুরখাইম। তাঁর মতে ধর্ম গোষ্ঠী-জীবন ও সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। আমরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে ধর্মের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আলোচনা করব।

ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে একটা সুসম্বদ্ধ মতবাদ সর্ব প্রথম প্রচার করেন নৃবিজ্ঞানী টেলার। তিনি ছিলেন ডারউইনের বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। তাই তিনি ধর্মের উদ্ভবের মধ্যে একটা বিবর্তন প্রক্রিয়ার সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে, আদিম মানুষ প্রথমে ভূত-প্রেত ও নিজ নিজ মৃত পূর্ব পুরুষের পূজা করতো। পরে তাদের মধ্যে প্রকৃতি পূজার উন্মেষ হয় এবং নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল, চাঁদ-তারা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা শুরু হয়। প্রকৃতি-পূজা থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় দেব-দেবীর মূর্তি-পূজার সৃষ্টি হয়। আদিম মানুষ প্রথমে অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা করতো। তারা ছিল বহু-ঈশ্বরবাদী। কালক্রমে তাদের মধ্যে পরমেশ্বরের ধারণার উদ্ভব হয় এবং সমাজে একেশ্বরবাদের আধিপত্য শুরু হয়। মোটকথা, টেলারের মতে, ধর্ম ভূত-প্রেত ও মৃত পূর্ব-পুরুষের পূজা দিয়ে আরম্ভ হয় এবং তার বর্তমান পরিণতি হচ্ছে একেশ্বরবাদ।

টেলারের মতে, ভূত-প্রেত ও মৃত-পূর্বপুরুষের পূজার উন্মেষ ঘটে আত্মার ধারণা থেকে। বস্তুতঃ টেলারের মতবাদের মূলভিত্তি আত্মার ধারণা। আদিম মানুষ নিজেকে মনে করতো দেহ ও আত্মার সমষ্টি। প্রত্যেক মানুষের দ্বৈত-অস্তিত্ব, দেহ ও আত্মা। দেহ ও আত্মা এই দুইমিলে মানব-জীবন। দেহ জড় পদার্থ। তার অস্তিত্ব বুঝতে আদিম মানুষকে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু আত্মাকে জড় পদার্থ বলা চলে না। আত্মার দৃষ্টি গ্রাহ্য নয়। দৃষ্টির অতীত যে আত্মা, তার অস্তিত্বের ধারণা আদিম মানুষের মনে কি করে এলো? টেলারের মতে, আদিম মানুষ আত্মার ধারণা পেয়েছে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি, তখন

অসাড়-দেহ শয্যার উপরে চলৎ-শক্তিহীন হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে আমরা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে কথা বলি ; ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে মিলিত হই এবং চলে ফিরে বেড়াই। ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখি, সেই একই শয্যাতে পড়ে আছি। দেহ যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। তবে কে কথা বললো, কে ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে চলাফেরা করলো? দেহ ছাড়া মানুষের নিশ্চয়ই আর একটি অস্তিত্ব আছে, দেহ ঘুমিয়ে থাকলে যে-অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং যা চলাফেরা করে ও কথা কয়। আদিম মানুষ স্বপ্নকে দৃষ্টি ভ্রম বলে মনে করতো না। সে যখন স্বপ্নে কারো সঙ্গে কথা বলতো বা কোথাও বেড়াতে যেতো, তখন সে মনে করতো, বাস্তবিক পক্ষে সে স্বপ্নে কথা বলেছে বা বেড়াতে গেছে। কিন্তু দেহ যেহেতু একই জায়গায় অসাড় হয়ে পড়ে থাকে, কাজেই এই কাজগুলো অন্য কোনও অস্তিত্বের দ্বারাই সংঘটিত হয়। মানুষের মধ্যে দেহ একটি অংশ মাত্র। দেহ ছাড়াও আর একটি অস্তিত্ব আছে, যে অস্তিত্ব জীবন্ত, যা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, এবং দেহ ত্যাগ করে বাইরে চলে-ফিরে বেড়াতে পারে। এই দ্বিতীয় অস্তিত্ব যখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন দেহ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। নিদ্রাতে দেহ তার দোসর থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। দেহের এই দোসরই আত্মা

মানুষ নিদ্রিত হলে আত্মা ক্ষণকালের জন্য দেহ ত্যাগ করে যায়। ফলে দেহ নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আত্মা যখন আবার দেহে ফিরে আসে, তখন দেহ ও আত্মা নিয়ে মানুষ আবার জেগে উঠে। আত্মাই মানুষকে জীবনী শক্তি দেয় এবং দেহকে প্রাণবন্ত করে তোলে। নিদ্রা হচ্ছে, দেহ থেকে আত্মার সাময়িক বিচ্যুতি।

মৃত্যুতে আত্মা দেহ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়। নিদ্রার শেষে আত্মা আবার ফিরে এসে দেহের সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু মৃত্যুর পরে আত্মা আর ফিরে আসে না। মৃত্যু হচ্ছে দেহ ও আত্মার চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ।

মৃত্যুর পরে চিরতরে বিচ্ছিন্ন আত্মা দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চলে-ফিরে বেড়াবার অবাধ স্বাধীনতা লাভ করে। মৃত মানুষের বিদেহী

আত্মা তখন প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। প্রেতাত্মারূপে মৃত্যু পরবর্তী আত্মার বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা থাকে মানুষের মতই। প্রেতাত্মাগুলো জীবিত মানুষের মাঝেই বিচরণ করে এবং তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী কেউ মানুষের মঙ্গল করে আর কেউ বা অঘটন ঘটায়। এই প্রেতাত্মাগুলো অবাধে মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। মানুষের দেহে প্রবেশ করে প্রেতাত্মা কখনও মানুষের উপকার করে, আবার কখনও অমঙ্গল ডেকে আনে। যদি কেউ ব্যাধিগ্রস্থ হয় বা কারো মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, তবে তার কারণ কোনও পরশ্রীকাতর দুর্বৃত্ত প্রেতাত্মা তার উপর ভর করেছে। অপরপক্ষে, কেউ যদি ভাগ্যবান হয়, কেউ যদি অন্যদের চেয়ে শক্তিশালী হয় বা শিকারে দক্ষ হয়, তার কারণ কোন পরহিতৈষী প্রেতাত্ম তার দেহে অধিষ্ঠান হয়েছে। মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, স্বাস্থ্য-ব্যাধির কারণ প্রেতাত্মা। কাজেই প্রেতাত্মাকে খুশী করা প্রয়োজন। মৃত্যুর পরে আত্মা প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। কাজেই মৃত পূর্ব-পুরুষের আত্মা-প্রেতাত্মারূপে অঘটন ঘটায় এবং মৃত পূর্ব-পুরুষের প্রেতাত্মাকে সন্তুষ্ট করা দরকার। এইভাবে মৃত পূর্ব-পুরুষের পূজা শুরু হয় এবং ধর্ম জন্ম নেয়।

পরবর্তীকালে আত্মার ধারণা থেকেই প্রকৃতি পূজা আরম্ভ হয়। টেলারের মতে, প্রকৃতি-পূজা আত্মার ধারণার সম্প্রসারিত রূপ। আদিম মানুষ ছিল শিশুর মত সরল এবং শিশুর মত তাদেরও সচেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করবার মানসিকতা ছিল না। শিশুর মনে প্রথম যার সম্পর্কে ধারণা জন্মে সে হচ্ছে মাতা-পিতা অর্থাৎ মানুষ। কাজেই মানুষের ধারণার আলোকে শিশু সব কিছুকে দেখে। যে-খেলনা নিয়ে সে খেলে, অথবা যেসব জিনিসের সংস্পর্শে সে আসে, সে-গুলোকে শিশু মানুষের মত সচেতন পদার্থ বলে মনে করে। আদিম মানুষের চিন্তাশক্তি শিশুর চিন্তাশক্তি থেকে উন্নত ছিল না এবং শিশুর মত সকল অচেতন পদার্থকে সে মানুষের মত সচেতন বলে মনে করতো। যেহেতু আদিম মানুষের ধারণায়, সে নিজে দেহ ও আত্মার সমষ্টি; সেই হেতু আদিম মানুষ সকল পদার্থকে দেহ ও আত্মার সমষ্টি

বলে যে ধারণা করবে, তাতে বিচিত্র কি। তাছাড়া স্বপ্নে মানুষ শুধু আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবকে দেখে না, সে নানা রকম জড় পদার্থ; যেমন—রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, গাছ-পালা, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতিও দেখে। কাজেই আদিম মানুষ ধরে নিলো যে, মানুষের মত অচেতন পদার্থেরও আত্মা আছে।

মৃত-পূর্ব-পুরুষের আত্মা যেমন কখনও মানুষের উপকার করে। আবার কখনও অপকার করে। নদী পানি প্রকৃতির বিভিন্ন অবদান-গুলো তেমনি মানুষের উপকার ও অপকার করে। নদী পানি দেয়, আবার প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভূমি কখনও ফসল দেয়, কখনও দেয় না। বৃষ্টি কখনও আসে মুষলধারায়, কখনও আসেই না। প্রকৃতির এই খাম-খেয়ালের কারণ, তার অধিষ্ঠান প্রেতাত্মা। প্রকৃতির খেয়ালীপনার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে, তার প্রেতাত্মাকে খুশী করা দরকার। এভাবে আত্মার ধারণা থেকে প্রকৃতি পূজার উদ্ভব হয়। চাঁদ, তারা, জল বায়ু, নদী-নালা, মেঘ-বৃষ্টি প্রভৃতি প্রকৃতির অবদানকে আদিম মানুষ পূজা করতো। কারণ তাদের মধ্যে আত্মা আছে এবং তাদের মধ্যে প্রেতাত্মা ভর করে আছে। আর এই প্রেতাত্মার প্রভাবে তারা মানুষের বাহ্যিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে।

টেলারের মতবাদের বিশেষত্ব তার সার্বজনীনতা। প্রায় সকল আদিম সমাজে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণা বিদ্যমান। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী সমাজে বিশ্বাস, আত্মা একটা দোসর, প্রতিচ্ছবি বা ছায়া—যা নিদ্রায় দেহত্যাগ করে দূরে যেতে পারে। মৃত্যুর পরে এই দোসর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাগর বা জঙ্গলের অধিষ্ঠান প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। এই প্রেতাত্মাগুলো মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে এবং তাদের প্রিয় মানুষকে অতি প্রাকৃত শক্তি দিয়ে থাকে। তবে মূলতঃ প্রেতাত্মা বিপদজনক এবং ব্যাধি ও মৃত্যুর কারণ। প্রেতাত্মা অশরীরী ও অদৃশ্য। কিন্তু কেউ কেউ দাবী করে যে, তারা প্রেতাত্মা দেখেছে এবং তাদের বর্ণনায় প্রেতাত্মা দেখতে ভয়ংকর ও কিম্ভূত কিমাকার। প্রেতাত্মা শীর্ষে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সঙ্গীত দ্বারা নিবারিত হয়। প্রেতাত্মা রামধনুতে চড়ে বেড়ায়, মাছ ও কাঁকড়া খায় এবং নাচে ও গান গায়।

আত্মা ও প্রেতাত্মা সম্পর্কে অনেক আদিম সমাজ থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়। মোটকথা, আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণা প্রায় সব সমাজেই ছিল। আত্মা ও প্রেতাত্মা অবশ্য এইসব আদিম সমাজের মানুষের ধারণায় ঠিক অশরীরী বা নিরাকার নয়। তাদের স্বভাব-চরিত্র কতকটা মানুষের মত।

প্রায় সব আদিম সমাজেই প্রেতাত্মার ধারণা ছিল। কিন্তু আদিম মানুষ তার সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তি দিয়ে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম কিনা. সে সম্পর্কে অনেক নৃবিজ্ঞানী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কোনও পূর্বসূত্র ছাড়া আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণায় পৌঁছতে হলে যে-বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তিবাদী মন থাকা দরকার, আদিম মানুষের তা' ছিল না। আদিম মানুষ জীবিকার প্রশ্ন নিয়ে বেশী সময় মাথা ঘামাতো। তার কারিগরি ও বস্তু-জ্ঞান ছিল নগণ্য। কিন্তু পারিপার্শ্বিক ছিল বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। এই পরিবেশে এবং অনুন্নত বুদ্ধিমত্তাকে মাত্র সম্বল করে, আদিম মানুষের পক্ষে এমন একটি যুক্তিবাদী এবং বিদগ্ধ মতবাদে পৌঁছানো কিছুতেই সম্ভব নয়।

টেলারের সর্বপ্রাণবাদ ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ধর্ম মৃত-পূর্ব-পুরুষের পূজা থেকে পরমেশ্বরের পূজায় রূপান্তরিত হয়েছে। টেলারের বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে, এ-কথা মেনে নিতে হয় যে, মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আরও রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী এবং রূপান্তর হতে হতে ধর্ম কালক্রমে পৃথিবী থেকে তিরোহিত হবে এবং বিজ্ঞান তার স্থান দখল করবে। কিন্তু আমরা ধর্মের কর্মিক সংজ্ঞায় দেখেছি যে ধর্ম এমন কতকগুলো কর্ম সম্পাদন করে, যা বিজ্ঞান করতে অক্ষম এবং এই কর্মের মধ্য দিয়ে ধর্ম জগতে বেঁচে রয়েছে।

ধর্মের সঙ্গে মানুষের ভাবাবেগ ও সংবেদনশীল অনুভূতি প্রগাঢ়-ভাবে সম্পৃক্ত। ধর্মের একটা সামাজিক ও গোষ্ঠিভিত্তিক দিকও রয়েছে। ধর্মের এই সামাজিক এবং ভাবাবেগের দিক অবজ্ঞা করে কেবলমাত্র যুক্তি-বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

আমরা দেখলাম, আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণায় পৌঁছতে হলে, যে যুক্তি-ভিত্তিক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, আদিম মানুষের মধ্যে সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে না। তাছাড়া টেলার আত্মা ও প্রেতাত্মাকে মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর মতে, জড়-বস্তু ও অচেতন পদার্থ পূজা পেতে পারে, যদি তার মধ্যে কোনও প্রেতাত্মা ভর করে। টেলারের বড় সমর্থক লাউই পর্যন্ত স্বীকার করতে পারেননি যে, আদিম মানুষ জড় পদার্থের পূজা করতো তার মধ্যে একটা প্রেতাত্মা ভর করেছে এই ধারণার জন্য। আদিম অনেক সমাজে জড়-বস্তু পূজিত হতো কোনও অধিষ্ঠান প্রেতাত্মার অস্তিত্ব ছাড়াই।

নৃবিজ্ঞানী মেরেট, টেলারের মতবাদের এই দুই অসুবিধা পরিহার করে ধর্মের উৎপত্তির অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতবাদকে 'মহা-প্রাণবাদ' বল হয়।

মেরেটের মতে, আদিম মানুষের মনে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণার উন্মেষের বহুপূর্বে ধর্মের ধারণার উন্মেষ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, অতি প্রকৃত শক্তির ধারণার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণার উদ্ভব হয়।

আদিম মানুষ যখন এমন কোনও বস্তুর সম্মুখীন হয়, যা অসাধারণ, যা সচরাচর দেখা যায় না, যাকে বোঝা যায় না, যাকে জানা যায় না; তখন আদিম মানুষের মনে সেই অতি-প্রাকৃতের প্রতি ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। এই ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময় থেকে তার মনে একটা নৈর্ব্যক্তিক দুজ্ঞের্য়র শক্তির ধারণা জন্মে এবং আদিম মানুষ ঐ অতিপ্রাকৃত বস্তুতে নৈর্ব্যক্তিক শক্তি আরোপ করে এবং তার সন্তুষ্টি বিধানে তৎপর হয়। মেরেটের মতে, বস্তুর অন্তর্নিহিত নৈর্ব্যক্তিক শক্তির জন্য আদিম মানুষ সেই বস্তুকে পূজা দেয়, তার আত্মা, তার ও প্রেতাত্মার জন্য নয়। আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণা আদিম মানুষের মনে অনেক পরে এসেছে। প্রথমে আদিম মানুষের মনে অতি-প্রাকৃতের প্রতি ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময় থেকে নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা জন্মে এবং যা কিছু লোকাতীত, যা কিছু জ্ঞান ও বুদ্ধির বাইরে তার মধ্যে সে একটা

নৈর্ব্যক্তিক শক্তি আরোপ করে তাকে পূজা করতে শুরু করে। পরে কোনও এক সময়ে আদিম মানুষের মধ্যে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণার সৃষ্টি হয় এবং তখন কোনও কোনও আদিম সমাজে নৈর্ব্যক্তিক শক্তির পরিবর্তে অথবা নৈর্ব্যক্তিক শক্তির পাশাপাশি প্রেতাত্মার ধারণাও বিস্তার লাভ করে। এই প্রসঙ্গে মেরেট প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বহুল প্রচলিত একটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। শব্দটি হচ্ছে 'মানা'। 'মানা' অর্থ হচ্ছে অতি প্রাকৃত শক্তি। 'মানা' এমন একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি, যা অসাধারণ, দুজ্ঞের্য় ও অবোধ্য এবং যা সচরাচর দেখা যায় না।

'মানা' নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বটে, কিন্তু যে-কোনও ব্যক্তি বা বস্তুতে এই শক্তি থাকতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে 'মানা' থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি বা বস্তু অসাধারণত্ব লাভ করে। কেউ যদি যুদ্ধে অনন্য সাধারণ বীরত্ব দেখায়, তবে তার কারণ তার মধ্যে 'মানা' রয়েছে। কোনও কারিগর যদি অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী হয়, তবে তার কারণ 'মানা'। কেউ যদি বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অন্য সবাইকে ডিঙিয়ে যায়, তবে তার মধ্যে নিশ্চয়ই 'মানা' আছে।

শুধু মানুষ নয়, অচেতন পদার্থ ও জড়বস্তুতেও 'মানা' থাকতে পারে। একটি বিশেষ আকৃতির পাথরে 'মানা' থাকতে পারে এবং এই 'মানা' সম্বলিত পাথরটিকে ক্ষেতে পুঁতে রাখলে ফসল ভালো হতে বাধ্য। মাদুলি ও কবচ যে অনেক সময় অসাধ্য সাধন করে, তার কারণ ঐ মাদুলি ও কবচে 'মানা' আছে।

'মানা'র অর্থে একটি অতি-প্রাকৃত নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বুঝায়। মানার অর্থের মধ্যে কোনও আত্মা বা প্রেতাত্মার ধারণা নেই। কোনও ব্যক্তি বা বস্তু অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয় নৈর্ব্যক্তিক শক্তির প্রভাবে—কোনও অধিষ্ঠান প্রেতাত্মার জন্য নয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আদিবাসীদের ধর্মজীবন মানাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং মানার পেছনে কোন আত্মা বা প্রেতাত্মার ধারণা নেই।

মেরেটের মতে এই অতিপ্রাকৃত নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণাই আদিম সমাজের প্রথম ধর্ম। প্রেতাত্মায় বিশ্বাস ধর্মের বিবর্তনে একটি পরবর্তী পদক্ষেপ মাত্র।

'মানা' বা নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা সহজ এবং জটিলতা শূণ্য। প্রেতাত্মার ধারণায় উপনীত হতে যে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, সে বুদ্ধিমত্তা না থাকলেও নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা করা সম্ভব। মোটকথা, আদিম মানুষের পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণায় পৌঁছানো অসম্ভব নয়। তাছাড়া এ ধারণা সচেতন ও অচেতন সকল বস্তুতেই আরোপ করা চলে।

টেলারের মতবাদের চেয়ে মেরেটের মতবাদ অধিকতর সরল ও সহজবোধ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্ব-প্রাণবাদের মত, এই মতবাদও সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী। কারণ মহাপ্রাণবাদ ধর্মের সামাজিক ও গোষ্ঠীরূপ সম্পর্কে একেবারে নীরব।

চতুর্থ অধ্যায়

যাদুবিদ্যা : ধর্ম ও বিজ্ঞান

মনীষী ফ্রেজার বলেন, ধর্মের জন্মের আগে যাদুবিদ্যার জন্ম এবং যাদুবিদ্যার ব্যর্থতা ধর্মের উৎপত্তির কারণ। তাঁর মতে, জড়জগতের যেমন ধাতু যুগের আগে পাথর যুগ, জ্ঞান জগতে তেমনি ধর্মযুগের আগে যাদুবিদ্যার যুগ।

ফ্রেজারের মতবাদ বুঝতে হলে, যাদুবিদ্যা সম্পর্কে জানতে হবে। ফ্রেজার নিজে যাদুবিদ্যা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। যাদু-বিদ্যার তাসের ঘর জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে দু'টি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ফ্রেজার এ-গুলিকে বলেছেন, সাদৃশ্যের সূত্র ও সংক্রণের সূত্র।

যাদুকর কাজ করে দু'টি প্রক্রিয়ায়। শত্রুকে যদি সে বিনষ্ট করতে চায়, তবে সে শত্রুর সদৃশ একটি মানুষ গড়ে। কখনও খড়-কুটো, মাটি, বালি বা মোম দিয়ে শত্রুর একটি প্রতিকৃতি বানায়; কখনও বালিতে আঁক দিয়ে শত্রুর সদৃশ একটি দেহ আঁকে। তারপর শত্রুর প্রতিকৃতিকে লাঠি দিয়ে প্রহার করে, কিংবা ছুরিকাঘাতে, বল্লম দিয়ে বা বিষাক্ত তীর দিয়ে সেটিকে বিদ্ধ করে। শত্রুর সদৃশটিকে প্রহার বা আহত করার ফলে, আসল শত্রুটি অনুরূপভাবে প্রহৃত ও আহত হয়। এখানে আমরা সাদৃশ্যের সূত্র পাচ্ছি। সদৃশ বস্তু বা ঘটনা সৃষ্টি করে। কোনও উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে সেই উদ্দেশ্যটি অনুকরণ করলে উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শত্রুকে প্রহার করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে শত্রুকে প্রহার করা হচ্ছে এমন একটা নকল ঘটনা সৃষ্টি করলে শত্রু প্রহৃত হবে এবং উদ্দেশ্য সাধিত হবে। যাদুকর যদি কোনও ঘটনা ঘটাতে চায়, তবে সেই ঘটনাকে অনুকরণ করলে বাস্তবে সেই ঘটনাটি ঘটবে। শত্রুকে প্রহার করা বা আহত করাই যদি যাদুকরের উদ্দেশ্য হয়, তবে শত্রুর সদৃশ একটি প্রতিকৃতি গড়ে তাকে প্রহার বা

আহত করলেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে এবং শত্রু প্রহৃত ও আহত হবে। আমরা যে উদাহরণ দিয়েছি, সেখানে যাদুকরের উদ্দেশ্য শত্রুকে প্রহার বা আহত করা। যাদুকর শত্রুর একটি সদৃশ গড়ে তুললো এবং ঐ সদৃশটিকে প্রহার বা আহত করলো। অর্থাৎ শত্রুকে প্রহার বা আহত করার উদ্দেশ্যটিকে যাদুকর যথাযথ অনুকরণ বা নকল করলো। প্রহার বা আহত করার অভিপ্রেত ঘটনাটা হুবহু নকল করার ফলে বাস্তবে শত্রু প্রহৃত বা আহত হবে। অর্থাৎ প্রহার বা আহত করার অভিপ্রেত ঘটনাটিকে অনুকরণ বা নকল করার ফলে বাস্তবে ঘটনাটা ঘটবে এবং শত্রু আহত বা প্রহৃত হবে। এই প্রক্রিয়ায় যাদুকর যে-যাদুবিদ্যা ঘটায়, ফ্রেজার তাকে বলেছেন সদৃশ-বিধান বা অনুকরণ যাদুবিদ্যা। এই যাদুবিদ্যার ভিত্তি-সাদৃশ্যের সূত্র। সদৃশ-ঘটনার অনুকরণ সদৃশ ঘটনার সৃষ্টি করে। বর্তমান যুগে রাজনৈতিক নেতাদের কুশ পুত্তলিকা দাহ করবার যে রেওয়াজ দেখা যায়, তা এই অনুকরণ যাদুবিদ্যার ধ্বংসাবশেষ।

ফ্রেজার অনুকরণ-যাদুবিদ্যার অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন। মাত্র কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করবো।

রেড ইণ্ডিয়ানরা কাঠ দিয়ে শত্রুর প্রতিকৃতি গড়ে এবং তার বুকে বা মাথায় সূচ বা তীর ঢুকিয়ে ভাবে যে, শত্রু একই সময়ে এবং শরীরের একই স্থানে সূচ বা তীর ফোঁটানোর ব্যথা অনুভব করছে। যদি তারা শত্রুকে হত্যা করতে চায়, তাহলে কতকগুলো মন্ত্র পড়ে কাঠের নকল প্রতিকৃতিটিকে হত্যা করে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, শত্রু নিহত হয়েছে।

রোগের চিকিৎসায় অনুকরণ-যাদুবিদ্যার ব্যবহার আদিম সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। ফরাসী দেশের আদিম মানুষদের বিশ্বাস ছিল যে, ঘন ঘন বমির কারণ, পাকস্থলী স্থানচ্যুত হয়ে নীচে ঝুলে পড়েছে। এ-ক্ষেত্রে যাদুকর-বৈদ্যকে ডাকা হয়। সে বিচিত্র মুখভঙ্গী করে এবং নিজের দেহকে মুচড়িয়ে-কুচকিয়ে নিজের পাকস্থলীটিকে স্থানচ্যুত করে ফেলে। পাকস্থলীটি স্থানচ্যুত হলে, যাদুকর-বৈদ্য আবার নানা মুখ-

ব্যাদান করে এবং শরীরটিকে মুচড়িয়ে-কুচকিয়ে পাকস্থলীটিকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনে। ফলে রোগীর পাকস্থলীটিও স্বস্থানে ফিরে আসে এবং বমি বন্ধ হয়। কোনও পরমাত্মীয় মারা যাচ্ছে? ভয় কি? ডাকা হলো দু'জন যাদুকর-বৈদ্যকে। একজন এসেই শুয়ে পড়বে রোগীর পাশে, যেন মারা গেছে। তাকে মৃত ধরে নিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করা হলো। ঘণ্টা খানেক সৎকারের ব্যবস্থা চলতে থাকবে; এবার দ্বিতীয় বৈদ্য আসরে অবতীর্ণ হবে। সে নানা মন্ত্র পড়ে মরার ভান করে পড়ে থাকা সঙ্গীকে তাজা করে তুলবে। সঙ্গী যাদুকর বৈদ্য উঠে বসতেই মৃত্যু-পথযাত্রী রোগী চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কারো ফোঁড়া হয়েছে। ডাকা হলো যাদুকর-বৈদ্য। ভারভিন গাছের শিকড় দু'ভাগ করে কাটা হলো। একভাগ রোগীর গলায় ঝুলানো হলো এবং আর একভাগ আগুনের উপর ধরা হলো। তাপে শিকড় যতই শুকিয়ে আসবে, ফোঁড়াও ততই শুকাবে। তবে সাবধান! বৈদ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না। তাহলে বৈদ্য শুকনো শিকড়টি পানিতে ফেলে দেবে এবং শিকড় যেই তাজা হয়ে উঠবে, ফোঁড়াও সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা দেবে।

বৃটিশ অধিকৃত কলম্বিয়ার আদিবাসী সমাজ মৎস্যোপজীবী। সব মাছের মওসুমে সমান মাছ মেলেনা। কোনও মাছের মওসুমে যদি মাছের অনটন দেখা দেয়, তা হলে তারা যাদু বিদ্যার শরণাপন্ন হয়। যাদুকর মাছের প্রতিকৃতি তৈরী করে এবং মাছ সাধারণতঃ যে-দিক থেকে আসে, সেই দিক থেকে মাছের সদৃশটিকে নদীতে ছেড়ে দেয়। উদ্দেশ্য, মাছের আগমনটি অনুকরণ করার ফলে মাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে আসতে থাকবে এবং নদী ভরে যাবে।

অনুকরণ-যাদুবিদ্যায় সদৃশ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ নেই এবং যোগাযোগও নেই। শত্রুর প্রতিকৃতি তৈরী করে তাকে বিনষ্ট করলেই শত্রু বিনষ্ট হয়—শত্রু এবং তার প্রতিকৃতির মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ থাকার প্রয়োজন নেই। যাদুকর এ প্রক্রিয়ায় কাজ না করে, শত্রুর একগাছি চুল, এক টুকরো নখ, পরিধেয় একখানা বস্ত্র যোগাড় করে সেটিকে

বিনষ্ট করে শত্রুকে বিনষ্ট করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পারে। এখানে শত্রুর অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে ছিল এমন বস্তুর সাহায্যে শত্রুকে ধ্বংস করা হচ্ছে। শত্রুর অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে ছিল এমন বস্তুর উপর যে ক্রিয়া করা হচ্ছে, তা শত্রুর উপর সংক্রমিত হচ্ছে এবং শত্রুর উপরও একই রকম ক্রিয়া হচ্ছে। শত্রুর চুলটিকে যদি পুড়িয়ে ফেলা হয়, তবে শত্রু পুড়ে মরবে। এখানে সংক্রমণের সূত্র কাজ করছে। যে দু'টি বস্তু একদা পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে ছিল, তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না এবং পরস্পর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন বস্তুদ্বয়ের একটির ভাগ্যে যদি কিছু ঘটে, তবে তার প্রভাব অন্যটির উপর পড়ে এবং উভয়ে একভাবে এবং এক সাথে ক্লিষ্ট হয়। কোনও লোকের মাথা থেকে যদি একটা চুল কেটে নেওয়া হয়। তবে সেই চুলের সঙ্গে লোকটির সংস্পর্শ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না এবং ঐ কাটা-চুলটার উপর কোন কিছু করলে তার প্রভাব লোকটির উপর পড়ে। অর্থাৎ একবার যদি দু'টি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তবে তারা চিরস্থায়ী বন্ধনে বাধা পড়ে এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও, তাদের সম্পর্ক বজায় থাকে এবং বিচ্ছেদের পরেও একের ভাগ্য অপরের ভাগ্যকে সমভাবে প্রভাবিত করে এবং একের ভাগ্যে কিছু ঘটলে, অপরের ভাগ্যেও হুবহু তাই ঘটে। অর্থাৎ একের ভাগ্য-বিচ্ছেদের পরেও অন্যের ভাগ্যে সংক্রমিত হয়। চুল একদা লোকটির দেহের সঙ্গে জড়িত ছিল; কেটে ফেলার পরও দেহের সঙ্গে চুলের সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। কর্তিত চুলকে পোড়ালে, চুলের সঙ্গে একদা সম্পর্কযুক্ত লোকটিও পুড়ে মরে। অর্থাৎ চুলের ভাগ্য, লোকটির ভাগ্যে সংক্রমিত হয়। ফ্রেজার এই যাদুবিদ্যাকে সংক্রমণ যাদুবিদ্যা বলে অভিহিত করেছেন।

দুধের দাঁত পড়লে, দাঁতটিকে ইঁদুরের গর্তে ফেলার রেওয়াজ আছে। এই রেওয়াজের ভিত্তি এই যে, পড়ে যাওয়া দাঁতটির সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না এবং পড়ে যাওয়া দাঁতটি ইঁদুরের সংস্পর্শে এলে, শিশুর নতুন দাঁতগুলো ইঁদুরের দাঁতের মত সুন্দর ও শক্ত হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলের আদিবাসীরা দুধের দাঁত হাতে নিয়ে বলে :

বড় ইঁদুর ! ছোট ইঁদুর !
এই যে আমার পুরনো দাঁত,
দয়া করে আমায় নতুন দাঁত দাও।

এই বলে দাঁতটিকে ইঁদুরের আস্তানায় ফেলে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য নতুন দাঁতগুলো সুন্দর ও শক্ত হয়ে গজাবে।

নিউ গিনির ওজোবালুক উপজাতির মধ্যে বিশ্বাস, শত্রুর কম্বল পুড়িয়ে ফেললে কম্বলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শত্রু মারা পড়ে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় টানা অঞ্চলে, যাদুকর শত্রুর অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্য শত্রুর পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করে এবং ঐ বস্ত্রটিকে একটু একটু করে আগুনে ঝলসায়। বস্ত্রটি আগুনে ঝলসানোর ফলে বস্ত্রটির সাথে একদা সম্পর্ক যুক্ত, কিন্তু তৎকালে বিচ্ছিন্ন শত্রু অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বস্ত্রটি ভস্মীভূত হলে শত্রু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রুশিয়ায় বলা হত যে, চোরকে যদি ধরতে না-ই পারা যায়, তার একটা কাপড় হস্তগত করতে পারলেই হলো। ঐ কাপড়টিকে ভালো করে উত্তম-মাধ্যম দিলে বেচারা চোর অসুখে পড়বেই।

দক্ষিণ-পূর্ব অষ্ট্রেলিয়া'র আদিম মানুষের বিশ্বাস, বালিতে বা মাটিতে রচিত পদাঙ্কের উপর শক্ত পদার্থ ফেললে, যার পদাঙ্ক সে খোঁড়া হয়ে যায়। কেউ যদি বাতে ক্লিষ্ট হয়, তার কারণ শত্রু তার পদ চিহ্নের উপর ভাঙ্গা কাঁচ ফেলেছে।

অনুকরণ-যাদুবিদ্যা ও সংক্রমণ যাদুবিদ্যা সর্বদা পৃথকভাবে অনুসৃত হয় না। যাদুকর সাধারণতঃ দু'টো সূত্র একযোগে ব্যবহার করে। মালয়দ্বীপে যাদুকর মোম দিয়ে শত্রুর সদৃশ প্রতিকৃতি গড়ে। শত্রুর দেহের সঙ্গে একদা সংশ্লিষ্ট নখ, চুল, চোখের পাতা ও ভুরু সংগ্রহ করে মোমের তৈরী প্রতিকৃতিতে সংযোজিত করে। সাত রাত ধরে যাদুকর মন্ত্র পড়ে এবং মোমের তৈরী শত্রুর সদৃশটিকে প্রদীপের আলোতে ঝলসায়। অষ্টম রাতে সদৃশটিকে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং প্রতিকৃতিটির

সঙ্গে সংযোজিত শত্রুর সঙ্গে একদা সংশ্লিষ্ট নখ, চুল, চোখের পাতা ও ভুরুও পুড়ে যায়। সদৃশ প্রতিকৃতি এবং শত্রুর সঙ্গে একদা সংশ্লিষ্ট নখ, চুল ইত্যাদি পুড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রু প্রাণ হারায়। এখানে দ্বি-বিধ যাদুবিদ্যা যুগপৎ অবলম্বিত হয়েছে। শত্রুর সদৃশকে পোড়োনো হয়েছে। আবার শত্রুর সঙ্গে একদা সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলোকেও পোড়োনো হয়েছে।

ফ্রেজার প্রথমে যাদুবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। পরে যাদুবিদ্যার সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ দেখাতে চেয়েছেন।

যাদুবিদ্যা দু'টো জাগতিক নিয়ম অনুযায়ী চালিত হয়—সাদৃশ্যের সূত্র ও সংক্রমণের সূত্র। যাদুকর-সূত্র দু'টি যদি ঠিক ঠিক প্রয়োগ করতে পরে, তাহলে অভীষ্ট ফল পাবে। অর্থাৎ ঘটনাচক্র অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। বিশ্ব-সংসার নিখুঁত, নিয়ত, অপরিবর্তনীয় এবং নির্দিষ্ট নিয়মের রাজত্ব। যাদুকর যদি নিয়ম সঠিকভাবে পালন করে, তবে অভিপ্রেত ফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। কার্যের সঙ্গে কারণের সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন। একই কারণ একই ফল উৎপাদন করে। যাদুকর যদি কিছু ঘটাতে চায়, তবে তাকে তার সূত্র সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। সে যদি শত্রুর সদৃশ বানিয়ে সাদৃশ্যের সূত্র অনুযায়ী সেটিকে হত্যা করে, তবে শত্রু অবশ্যই বিনষ্ট হবে। কোনও প্রেতাত্মা, কোনও নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বা কোনও পরমেশ্বর ঘটনাচক্রকে তার সুনির্দিষ্ট এবং নিয়মিত পথ থেকে বিপথে চালিত করতে পারে না। কোন শক্তিই কার্যের সঙ্গে কারণের সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে না। যাদুকর যদি ঠিকমত সাদৃশ্যের সূত্র বা সংক্রমণের সূত্র প্রয়োগ করে, তবে কোনও প্রেতাত্মা, কোনও নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বা কোনও পরমেশ্বর তাকে অভীষ্ট-ফল থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। কাজেই কোনও অতি-প্রাকৃতশক্তি বা কোনও প্রেতাত্মাকে আবাহন করার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতির প্রতি যাদুকরের দৃষ্টিভঙ্গী তাই উদ্ধত্যপূর্ণ। কারণ সে জাগতিক নিয়ম জানে এবং সূত্র প্রয়োগ করে নিশ্চিতভাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে নিজের কাজে লাগাতে সক্ষম।

বিজ্ঞান ও প্রকৃতিকে নিজের বশে এনে মানুষের কাজে লাগায়। পানিকে বাষ্পে রূপান্তরিত করে বিজ্ঞানী রেলগাড়ী চালায়, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পানি তৈরী করে। বিজ্ঞানের এই ক্ষমতা জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের মতে, ঘটনা-প্রবাহের পেছনে কতকগুলো অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম কাজ করে। বিজ্ঞান এ-সব জাগতিক নিয়ম আবিষ্কার করে এবং এই অপরিবর্তনীয় ও অমোঘ নিয়ম প্রয়োগ করে অভীষ্ট ফল লাভ করে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মেশালে পানি উৎপন্ন হয়; পানি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে রেল চালাতে পারে। এই যে সূত্রগুলো বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, তা চিরন্তন, অমোঘ ও অপরিবর্তনীয়। কাজেই সূত্রগুলো সঠিক প্রয়োগ করে বিজ্ঞান সঠিক ফল লাভ করে। বিজ্ঞান কোনও সচেতন শক্তি, প্রেতাত্মা বা নৈর্ব্যক্তিক শক্তির মুখাপেক্ষী নয় এবং এ ধরনের কোন শক্তিকে আবাহনও করে না।

বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যা উভয়েই জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে তাদের ধারণা বিভিন্ন। জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে বিজ্ঞানের ধারণা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত। বিজ্ঞানী গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে নির্ভুল সূত্র এবং ফর্মুলায় উপনীত হন। নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মেশালে পানি তৈরী হয়, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পানি বাষ্পীভূত হয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে—এইসব সূত্র পরীক্ষিত সত্য। বৈজ্ঞানিক ঠিক মত ফর্মুলা অনুসরণ করলে পানি উৎপন্ন হবেই এবং রেলগাড়ী চলবেই। জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সূত্র ও ফর্মুলাগুলো গবেষণার কষ্টি-পাথরে যাচাই করা সত্য। কিন্তু জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে যাদুবিদ্যার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যাদুকর সূত্র ও ফর্মুলাগুলো অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। সাদৃশ্যের সূত্র বা সংক্রমণের সূত্রের পেছনে ভিত্তি নেই। যাদুকর যে

মন্ত্রতন্ত্র অবলম্বন করে অভিষ্ট সিদ্ধ করতে চায়, তার ফলপ্রসূতা সম্পর্কে প্রমাণ নেই। সুতরাং যাদুবিদ্যা ভ্রান্ত। ফ্রেজার বলেন, যাদুবিদ্যা হচ্ছে ভ্রান্ত বিজ্ঞান।

যুগে যুগে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করে নিজের সেবায় নিয়োজিত করার উপায় খুঁজেছে। সে বের করেছে নানা সূত্র, নানা ফর্মুলা, নানা প্রক্রিয়া। এ গুলোর কিছু কিছু কার্যক্ষেত্রে ফলদায়ক এবং বেশীর ভাগই বাজে। যে-গুলো ফলদায়ক, সে-গুলোই বিজ্ঞান। যে-গুলো বাজে, সে-গুলো যাদুবিদ্যা। বিজ্ঞান সত্য, যাদুবিদ্যা মিথ্যা।

বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যা জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী। কিন্তু ধর্ম জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাস করে না। ধর্মের মতে, মানুষের চেয়ে উচ্চতর একটি সচেতন শক্তি মানব-জীবন ও প্রাকৃতিক ধারাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে এবং এই অতি-মানবিক সচেতন শক্তির আরাধনা অভীষ্ট লাভের একমাত্র পন্থা। ঘটনাচক্র একটি অতি-প্রাকৃত সচেতন শক্তির সজ্ঞান-ইচ্ছা ও ইঙ্গিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সচেতন শক্তি ঘটনাচক্রকে ইচ্ছামত একদিকে প্রবাহিত করতে পারে; আবার ইচ্ছা করলে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে অন্যদিকেও চালিত করতে পারে। অর্থাৎ ঘটনাচক্র অপরিবর্তনীয় ও অমোঘ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বিশ্ব-সংসার অপরিবর্তনীয় নিয়মের রাজত্ব নয়; বরং একটি সচেতন শক্তির সজ্ঞান-ইচ্ছার রাজত্ব। এই শক্তি ঘটনাচক্রকে ইচ্ছামত চালায়; কোন নিয়ম-কানুন মানতে এই অতি-প্রাকৃত শক্তি বাধ্য নয়; বরং সকল কিছু এই শক্তির ইচ্ছার অধীনে। ঘটনাচক্র অমোঘ নিয়মে যন্ত্রের মত কাজ করে না, একটি সচেতন শক্তির ইচ্ছায় কাজ করে। সুতরাং মানুষের ভাগ্য সেই সচেতন শক্তির মর্জির উপর নির্ভর করে। এই শক্তি ইচ্ছা করলে মানুষের মঙ্গল করতে পারে; ইচ্ছা করলে অমঙ্গল ঘটাতে পারে। এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, এমন শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে পরিত্রাণ নেই। এই সচেতন শক্তিকে যদি পূজায়, আত্মসমর্পণে, বলিদানে, নৈবেদ্য প্রদানে, নাচে-গানে সন্তুষ্ট করা যায়, তাহলে এই শক্তি ঘটনাচক্রকে মানুষের অমঙ্গলের

পথ থেকে ফিরিয়ে মঙ্গলের পথে চালিত করতে পারে। এই শক্তি যদি রুষ্ট হয়, কুপিত হয়, তাহলে সর্বনাশ। কাজেই এই সর্বশক্তিমানকে তুষ্ট রাখা দরকার। ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী তাই ক্ষুদ্রতার, আত্মসমর্পণের তোষামোদের, আরাধনার। কিন্তু যাদুকর তার এবং ঘটনাচক্রের মধ্যে কোনও তৃতীয় শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ঘটনাচক্র কতকগুলো জাগতিক নিয়মে মেশিনের মত কাজ করে। এই নিয়মের রাজ্যে কোনও শক্তি অনিয়ম আনতে পারে না। যাদুকর জাগতিক নিয়মগুলো সুষ্ঠু প্রয়োগ করে ঘটনাচক্রের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করে এবং ঘটনাচক্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। যাদুকরের দৃষ্টিভঙ্গী তাই উদ্ধত্যের এবং আধিপত্যের। সে আপন শক্তির মদে মত্ত। ঘটনাচক্রকে সে পরোয়া করে না; বরঞ্চ ফর্মুলা প্রয়োগ করে ঘটনাচক্রকে তার সেবা করতে বাধ্য করে।

ফ্রেজার স্বীকার করেন যে, যাদুবিদ্যাতে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস আছে এবং যাদুকর প্রেতাত্মা নিয়েও কাজ করে। কিন্তু ফ্রেজার বলেন, ধর্ম প্রেতাত্মাকে যেমন সচেতন শক্তিরূপে দেখে, যাদুবিদ্যা প্রেতাত্মাকে তেমন দৃষ্টিতে দেখে না। যাদুকরের দৃষ্টিতে, প্রেতাত্মা ঠিক সচেতন শক্তি নয়। যাদুকরের মতে, প্রেতাত্মা ও জাগতিক নিয়মের অধীন এবং অপরিবর্তনীয় জাগতিক নিয়মানুসারে প্রেতাত্মাও মেশিনের মত কাজ করে। যাদুকর যথাযথ ফর্মুলা খাটিয়ে প্রেতাত্মাকে উদ্দেশ্য সাধনের ক্রীড়নকে পরিণত করতে পারে। প্রেতাত্মাকে তাই যাদুকর পরোয়া করে না। বরং প্রেতাত্মাকে সেকথা শুনতে বাধ্য করে। প্রাচীন মিসরে যাদুকর দেবতাকে ভয় করতো না; বরঞ্চ আদেশ না মানলে সে দেবতাকে ধ্বংস করবার হুমকি দিতো।

ইতিহাসে ধর্ম ও যাদুবিদ্যার মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, তার কারণ ধর্মের বিনীত ও অনুগত দৃষ্টিভঙ্গী, আর যাদুবিদ্যার উদ্ধত ও গর্বিত দৃষ্টিভঙ্গী। যাদুকরের ঔদ্ধত্য ও বেপরোয়া ভাব বিনয়াবনত ধার্মিক সহ্য করতে পারে না। তাই ধর্মগুরুগণ যাদুকরের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন।

আদিম সমাজে কিন্তু ধর্ম ও যাদুবিদ্যা দু'টোই ছিল। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আদিম মানুষ পূজা অর্চনায় দেবতাকে খুশী করতে চেষ্টা করেছে; আবার একই সঙ্গে যাদুকরকে ডেকে মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ করেছে। একই অনুষ্ঠানে আদিম মানুষ যুগপৎ ধর্মীয় আচার-পদ্ধতি ও যাদুবিদ্যার প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে। আদিম সমাজে মানুষ তার প্রয়োজনে শুধু ধর্মযাজক বা শুধু যাদুকরকে ডাকেনি; একই সঙ্গে দু'জনের শরণাপন্ন হয়েছে। কি প্রাচীন ভারতে, কি প্রাচীন মিসরে, কি আধুনিক মালে-নেশিয়ায়, ধর্মীয় আচার-পদ্ধতি ও যাদুকরের মন্ত্রতন্ত্র পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে।

আদিম সমাজে ধর্ম ও যাদুবিদ্যার মিশ্রণ ও সমন্বয় ফে্জার অস্বীকার করেননি। তবে তাঁর মতে, ধর্ম ও যাদুবিদ্যার এই মিলনের পূর্বে এমন একটা যুগ ছিল, যখন মানুষ শুধু যাদুবিদ্যার কথা জানতো, ধর্মের কথা জানতো না। অর্থাৎ যাদুবিদ্যা তুলনামূলকভাবে ধর্মের চেয়ে প্রাচীন। ফে্জার তিনটি যুক্তির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

প্রথমতঃ, যাদুবিদ্যার ধারণা ধর্মের ধারণার চেয়ে সহজ, সরল ও জটিলতা শূন্য। যাদুবিদ্যা দু'টো সূত্র অবলম্বন করে—সাদৃশ্যের সূত্র ও সংক্রমণের সূত্র। অর্থাৎ যাদুবিদ্যা পরস্পরের সদৃশ দু'টি বস্তুর মধ্যে এবং পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'টি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ আরোপ করে। এই ধরনের সম্বন্ধ আরোপ করাকে ভাবানুষঙ্গ বলে। টেবিল বললেই চেয়ারের কথা মনে আসে। অর্থাৎ আমরা মনে মনে টেবিলের সঙ্গে চেয়ারের সম্বন্ধ করি। কলমের কথা মনে এলেই কালির কথা মনে আসে; বইয়ের কথা বললেই খাতার কথা মনে পড়ে। কালি ও কলম, বই ও খাতার মধ্যে আমরা ভাবানুষঙ্গ করি। যাদুবিদ্যা দু'টি সদৃশ বস্তু বা দু'টি সংশ্লিষ্ট বস্তুর মধ্যে ভাবানুষঙ্গ করে। কাজেই যাদু-বিদ্যার ধারণা ধর্মের ধারণার চেয়ে সহজতর।

বিপরীত পক্ষে, ধর্ম প্রকৃতির ধারার মধ্যে একটা অজ্ঞের তৃতীয় পক্ষকে টেনে আনে এবং একটা সচেতন শক্তি কল্পনা করে। ধর্ম সচেতন শক্তির যে ধারণা করে, সে ধারণায় পৌঁছতে হ'লে উন্নততর

বিবেক-বুদ্ধি এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির প্রয়োজন। কাজেই আদিম মানুষ প্রথমে যাদুবিদ্যাকে আশ্রয় করেছে এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশের ফলে পরবর্তীকালে ধর্মের ধারণা জন্মেছে।

দ্বিতীয়তঃ ফ্রেজারের মতে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সমাজ পৃথিবীর প্রাচীনতম সমাজ। এই প্রাচীনতম সমাজে যাদুবিদ্যা আছে, কিন্তু ধর্ম নেই। আদিম অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করে, কিন্তু কোনও উচ্চতর নৈর্ব্যক্তিক শক্তিকে পূজা করে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদিম সমাজে ধর্মের আগে যাদুবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে।

তৃতীয়তঃ কোনও সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের লক্ষণ তার সারল্য ও একত্ব। যে সংস্কৃতি যত সনাতন, সে সংস্কৃতি তত বৈচিত্র্যহীন। সমাজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য আসে, দল ও মতের বিভিন্নতা দেখা দেয়। আধুনিক সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়। আধুনিক জগতে নানা মত, নানা পথ আর নানা আচারের সমারোহ। কিন্তু প্রাচীন সমাজে এত বৈচিত্র্য ছিল না। জগতে কখনও ধর্মমতের একতা ছিল না। বিভিন্ন সমাজের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি বিভিন্ন। একই দেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মমত ও আচার-পদ্ধতির সাক্ষাৎ মেলে। আবার একই যুগে ধর্ম নিয়ে মতভেদ ও মতবিরোধ দেখা যায়। কিন্তু যাদুবিদ্যার রূপ সর্বকালে ও সর্বদেশে এক এবং যাদুবিদ্যা একই সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাদুবিদ্যার একত্ব ও ধর্মের বিভিন্নতা প্রমাণ করে যে, যাদুবিদ্যা প্রাচীন এবং ধর্ম নবীন।

যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী আদিম সমাজে ধর্মের উৎপত্তি হলো কি করে? ফ্রেজার বলেন, যাদুবিদ্যার ব্যর্থতা, ধর্মের উৎপত্তির কারণ। যাদুবিদ্যা ভ্রান্ত ও মিথ্যা। একটা মিথ্যা ও ভ্রান্তি নির্বোধ লোককেও চিরকাল ধোকা দিতে পারে না। সত্য কখনও চাপা থাকে না। যাদুবিদ্যার অসারতা একদিন না একদিন উপলব্ধ হতে বাধ্য।

আদিম সমাজে কিছু জ্ঞানী লোক অবশ্যই ছিল এবং তাদের চিন্তাধারা ছিল সাধারণ লোকের উর্ধ্বে। যাদুবিদ্যার অসারতা তাদের চোখ এড়াতে পারেনি এবং ক্রমশঃ তাদের মনে যাদুবিদ্যার কার্যকারিতা সম্পর্কে

সন্দেহ ঢুকতে থাকে। যাদুকর সর্বদা সফলকাম হতো না। তার যাদু অভীষ্ট পূরণে ব্যর্থ হলে, সে দোহাই দিতো যে, ফর্মুলা ঠিক প্রয়োগ হয়নি কিংবা অন্য যাদুকর বিপরীত ফর্মুলা প্রয়োগ করে তার যাদুকে ঠেকিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা বোদ্ধাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে চিরদিন ফাঁকি দিতে পারেনি। তারা দেখেছে যে, যাদুকর তার ফর্মুলা দিয়ে বৃষ্টি আনতে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ অনেক সময় যাদুকরের সাহায্য ছাড়াই বৃষ্টির ঢল নেমেছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। যাদুকর অনেকক্ষেত্রেই রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু যাদুবিদ্যা প্রয়োগ না করেও অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। একদিকে যাদুবিদ্যা ঘটনাচক্রকে বশ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, অপরদিকে যাদুবিদ্যার সহায়তা ছাড়াই অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে যাদুবিদ্যায় আস্থা রাখা কঠিন। কাজেই প্রশ্ন জেগেছে—যাদুবিদ্যাকে বিফল করে দিয়ে ঘটনাচক্রকে নিয়ন্ত্রিত করছে কে? জগৎ সংসারের পেছনে নিশ্চয়ই এমন একটি শক্তি আছে, যাকে যাদুবিদ্যা বশে রাখতে অক্ষম এবং যে শক্তি ইচ্ছামত ঘটনাচক্রকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। যাদুবিদ্যা এই শক্তিকে বশ করে অভীষ্ট সাধনে বাধ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে উপায় কি? বিকল্প কোনও ব্যবস্থা কি সম্ভব? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধমক দ্বারা কাজ না হলে, আমরা তোষামোদের আশ্রয় নেই। এ শক্তির বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হবার কারণ নেই। ফর্মুলা প্রয়োগ করে, ভয় দেখিয়ে, আদেশ দিয়ে যাদুবিদ্যা অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারছে না। কাজেই ঔদ্ধত্য ত্যাগ করে তোষামোদে এই শক্তিকে প্রীত করা ছাড়া উপায় নেই। যাদুবিদ্যা যতই পদে পদে ব্যর্থ হতে লাগলো, ততই মানুষ নিজেকে অসহায় ভাবতে লাগলো এবং ততই বিশ্ব-সংসারের নিয়ন্তা অজ্ঞেয় শক্তির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেলো। আদিম মানুষ তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে, নিজের মত একটি সচেতন শক্তি কল্পনা করলো। এই শক্তি ঘটনাচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সচেতন শক্তি মানুষের চেয়ে অনেক বড় মানুষের চেয়ে বিশাল এবং ক্ষমতাবান। এই সচেতন শক্তিকে খুশী করতে পারলেই অভীষ্ট লাভ সম্ভবপর। কাজেই শুরু হলো পূজা, অর্চনা, বলিদান, নৈবেদ্য প্রদান। জন্ম নিল ধর্ম।

ধর্ম ও যাদুবিদ্যা সম্পর্কে ফ্রেজারের আলোচনা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

ফ্রেজারের মতে, ধর্ম ও যাদুবিদ্যার প্রভেদ মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। যাদুবিদ্যা জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাস করে; ধর্ম করে না। যাদুকর উদ্ধত ও গর্বিত; ধার্মিক অনুগত ও বিনয়াবনত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ পার্থক্য খুব জোরালো নয়। যাদুকর সজ্ঞানে জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী, একথায় প্রমাণ নেই। বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী আদিম সমাজের যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। কিন্তু তাঁরা যাদুকরদের মধ্যে জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তায় সজ্ঞান বিশ্বাস খুঁজে পাননি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাদুকরের দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্ধত্যপূর্ণ বা গর্বিত বলা যায় না। যাদুকর মন্ত্র উচ্চারণ করে গুরুগম্ভীরভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে এবং ভক্তিচিত্তে। তার মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব থাকে, যাকে ঠিক ধর্ম ভাব না বলা গেলেও, ঔদ্ধত্য বা আধিপত্যের ভাব বলা চলে না। নৃতত্ত্ববিদ মেরেট কয়েকটি মন্ত্র এবং স্তবস্তুতি পাশাপাশি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, শাব্দিক দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য নগণ্য। সামান্য একটু এদিক সেদিক করলে ধর্মীয় স্তবস্তুতিকে মন্ত্র বলে এবং যাদুবিদ্যার মন্ত্রকে স্তবস্তুতি বলে চালানো যায়। যাদুকর তার মন্ত্রকে পবিত্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে এবং সংগোপনে রক্ষা করে। অনেক আদিম সমাজে দেখা যায় যে, যাদুকর মন্ত্র পাচ্ছে দেবতার কাছ থেকে। দেবতাকে পূজা ও উপাচারে সন্তুষ্ট করে, যাদুকর দেবতার কাছ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ মন্ত্র লাভ করে।

ফ্রেজার যাদুবিদ্যার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যে যুক্তি দিয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেছেন, যাদুবিদ্যার ধারণা ধর্মের ধারণা থেকে সরল ও সহজবোধ্য। তার যুক্তির সপক্ষে তিনি পশুকুলের আচরণকে উপস্থিত করেছেন। জীব জগতে পশুদের ভাবানুসঙ্গ করতে দেখা যায়। যাদুবিদ্যাও ভাবানুসঙ্গ করে। অর্থাৎ যাদুবিদ্যার মূলসূত্র এত সহজ যে, পশুরাও তা বোঝে এবং ব্যবহার করে। পশুকুল কিভাবে

ভাবানুসঙ্গ করে, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সে বিতর্ক না তুলেও প্রশ্ন করা যায়, যাদুকরের মত পশুরাও কি জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাস করে? পশুরাও কি তাদের শত্রু শিকারীর প্রতিকৃতি তৈরী করে তাকে বধ করে? নিশ্চয়ই নয়। এ ধরনের আচরণ পশুকুলের উপর আরোপ করা চলে না। কাজেই ভাবানুসঙ্গ সহজ হতে পারে; কিন্তু জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তা সহজবোধ্য নয়। "বিশ্ব-সংসার অমোঘ নিয়মের দ্বারা চালিত হয়"—"বিশ্ব সংসার একটি সজ্ঞান-শক্তি দ্বারা চালিত হয়"—এই দু'টি ধারণার মধ্যে কোনটি সরল ও সহজবোধ্য তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

ফ্রেজারের মতে, অষ্ট্রেলীয় আদিম সমাজ জগতের প্রাচীনতম সমাজ। কিন্তু অষ্ট্রেলীয় আদিম সমাজকে আজ আর প্রাচীনতম সমাজ বলে ধরা হয় না। আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জে ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে যে আদিম সমাজের পরিচয় পাওয়া গেছে, তারা অষ্ট্রেলীয় সমাজের চেয়ে প্রাচীন না হলেও, অষ্ট্রেলীয় সমাজের সমসাময়িক। এই আদিম সমাজগুলোতে ধর্ম ও যাদুবিদ্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে এবং ধর্মকে যাদুবিদ্যা থেকে পৃথক করা অসম্ভব।

ফ্রেজার বলেছেন, ধর্ম বৈচিত্র্যময়, কিন্তু যাদুবিদ্যা অভেদ ও এক। কিন্তু যাদুবিদ্যাতেও বৈচিত্র্য আছে। মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার উপজাতীয়দের মধ্যে অনুকরণ যাদুবিদ্যা আছে, কিন্তু সংক্রমণ যাদুবিদ্যা নেই। মন্ত্রের গুরুত্ব সব সমাজে এক নয়, পলিনেশিয়া ও নিউগিনিতে মন্ত্রই প্রধান। কিন্তু উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান সমাজে মন্ত্র গৌণ।

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে ফ্রেজারের মতবাদ গ্রহণ করা চলে না। কারণ আদিম সমাজে অবিমিশ্র ধর্ম বা অবিমিশ্র যাদুবিদ্যার অস্তিত্ব নেই। ধর্ম সব আদিম সমাজেই যাদুবিদ্যার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। দেশ ও কালভেদে ধর্ম ও যাদুবিদ্যার সম্পর্কের তারতম্য হয়; কিন্তু আদিম জগতে এমন ধর্ম বিরল যার সঙ্গে যাদুবিদ্যার মিশ্রণ ঘটেনি।

ধর্ম ও যাদুবিদ্যার এই সমন্বয়ের কারণ, উভয়ের সাদৃশ্য। ধর্ম ও যাদুবিদ্যা কেউই অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

উভয়ের ভিত্তি কতকগুলো বিশ্বাস, যে বিশ্বাসগুলোকে গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

যাদুবিদ্যা ও ধর্মের উদ্দেশ্য এক। উভয়ই জীবনের হতাশা, ভয়ভীতি এবং অজানা ভবিতব্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্র ব্যাপক; যাদুবিদ্যার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। ধর্ম জন্ম মৃত্যু, জীবনের অর্থ, পরিত্রাণের উপায়—প্রভৃতি জীবনের চরম সমস্যাগুলো নিয়ে ব্যাপৃত। যাদুবিদ্যার আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ, ফলন বৃদ্ধি, যুদ্ধে বিজয়, রোগ নিরাময় প্রভৃতি সাময়িক এবং উপস্থিত সমস্যাগুলো নিয়ে ব্যস্ত।

শুধু ধর্ম ও যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে নয়; বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রেও ফ্রেজারের মত অভ্রান্ত নয়। ফ্রেজার বলেন, বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যা উভয়ে জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী। কিন্তু বাস্তবে জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে যাদুকরের ধারণা খুব স্পষ্ট নয় এবং একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে না যে, যাদুকর বিজ্ঞানীর মত নিয়মের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী। তবে বিজ্ঞানের মত যাদুবিদ্যাও কতকগুলো ফর্মুলা নিয়ে কাজ করে এবং ফর্মুলা যথাযথ প্রয়োগ করে অভীষ্ট ফল আশা করে। কিন্তু বিজ্ঞানের ফর্মুলা বিফল হলে, বিজ্ঞানী তার ফর্মুলা পুনঃ বিশ্লেষণ করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ফর্মুলা প্রয়োজনীয় সংশোধন করে। কিন্তু যাদুকর তার ফর্মুলার ব্যর্থতাকে স্বীকার করে না এবং ফর্মুলা ব্যর্থ হলে অন্য যাদুকরের উপর দোষ আরোপ করে, কিন্তু ফর্মুলার পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে না। তার কারণ যাদুবিদ্যার ভিত্তি বিশ্বাস ও ভাবাবেগ। বিজ্ঞানের ভিত্তি অভিজ্ঞতা ও যুক্তি। যাদুকর রক্ষণশীল এবং ফর্মুলা আঁকড়িয়ে ধরে থাকে। জ্ঞানের অনুশীলন যাদুবিদ্যার অসারতা উদঘাটিত করে। সুতরাং যাদুকর জ্ঞানের বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কাজেই যাদুবিদ্যা বিজ্ঞানের বিকাশের পরিপন্থী।

ম্যালিনওস্কী বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, যদিও যাদুবিদ্যা ও বিজ্ঞান আপাতঃদৃষ্টিতে অনুরূপ মনে হয়, কিন্তু আসলে তারা পরস্পর থেকে ভিন্ন। অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানের

জন্ম, যাদুবিদ্যার উৎস ঐতিহ্য। বিজ্ঞান যুক্তি নির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু যাদুবিদ্যা যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের ধার ধারে না। যাদুকর একটা অতীন্দ্রিয় জগতে বাস করে আর বৈজ্ঞানিকের বাস বাস্তব জগতে। বিজ্ঞান সকলের জন্য এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু যাদুবিদ্যার দ্বার সাধারণের জন্য রুদ্ধ এবং একটি সুবিধাবাদী শ্রেণী যাদুবিদ্যার ফল ভোগ করে।

ম্যালিনওস্কী বলেন, আদিম সমাজে বিজ্ঞান ছিল অনুন্নত। তার মতে, আদিম মানুষের বিজ্ঞান ছিল মূলতঃ প্রযুক্তিবিদ্যা। কিন্তু তারা যাদুবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভেদ অবহিত ছিল। আদিম মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যার বদলে যাদুবিদ্যা ব্যবহার করতো না; যেখানে প্রযুক্তি-বিদ্যা নিরুপায়, সেখানেই শুধু যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিতো। উদাহরণ স্বরূপ ম্যালিনওস্কী কৃষিজীবি ট্রোবিয়াণ্ড দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন যাত্রা প্রণালীর উল্লেখ করেছেন। ট্রোবিয়াণ্ড দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিক জ্ঞানের অভাব ছিল না। কি করে ভূমি কর্ষণ করতে হয়, কোন্ ক্ষেত কোন্ ফসলের জন্য উপযোগী, কোন্ ফসল কোন্ ঋতুতে ভালো ফলে, কখন হাল দিতে হয়, কখন বীজ বুনতে হয়, কখন নিড়াতে হয়, কখন শস্য কাটতে হয় এবং কোন্ ফসলের জন্য কেমন হাল, নিড়ানি এবং বপন উপযুক্ত, সে সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট জ্ঞান ছিল। অভিজ্ঞতা থেকে তারা এ প্রযুক্তিক জ্ঞান লাভ করেছে এবং প্রযুক্তিক জ্ঞান প্রয়োগ করে তারা প্রচুর ফসল ঘরে তোলে। কৃষিকাজে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে যাদুবিদ্যার কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু একথা সত্য যে, আদিম ট্রোবিয়াণ্ড অধিবাসিদের মধ্যে যাদুকরের প্রভাব রয়েছে। তার কারণ কি? তার কারণ, একদিকে যেমন কৃষিকাজের প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে তারা সম্যক অবহিত ছিল, অপরদিকে তারা তেমনি একথাও উপলব্ধি করেছিল যে, কৃষিকাজের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করেও আশানুরূপ ফসল না পাওয়া যেতে পারে। এক বছর ভালো ফসল হয়, এক বছর হয় না।

কোনও বছর ফসল পোকায় কেটে ফেলে। এক বছর হয় অতিবৃষ্টি; এক বছর হয় খরা। কখনও বা প্লাবনে ফসল ভাসিয়ে দিয়ে যায়। এই যে অজ্ঞাতপূর্ব দুর্বিপাক ফসলের বিপদ ডেকে আনে, প্রযুক্তি-বিদ্যা তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। কাজেই অজানিত দুর্বিপাকের কবল থেকে রক্ষা পেতে, আদিম মানুষ যাদুবিদ্যার শরণাপন্ন হয়। স্বাভাবিক, সাধারণ এবং গতানুগতিক সমস্যাগুলো আদিম মানুষ প্রযুক্তিক জ্ঞান দিয়ে সমাধান করতো; কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব দুর্বিপাকের অশুভ হাত থেকে রক্ষার জন্য যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিতো।

বিজ্ঞানের সঙ্গে যাদুবিদ্যার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাদের বিরোধই প্রকটতর। যাদুবিদ্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে ধর্ম তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক কি?

সাধারণ দৃষ্টিতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ দৃষ্টিগোচর হয়। মুক্ত চিন্তা বিজ্ঞানের ভিত্তি। বিজ্ঞানী অন্ধ মত পোষণ করে না এবং প্রচলিত রীতি আঁকড়ে ধরে থাকে না। কিন্তু ধর্মের মূলে বিশ্বাস আর গোঁড়ামী। ধর্মের নির্দিষ্ট বিশ্বাস ও ধারণা আছে; ধর্ম সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকে। কোনও যুক্তির অবতারণা না করে ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হয়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল তাই অনেক ধর্মীয় বিধানের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে হবে।

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের চারটি বিকল্প সম্বন্ধ হতে পারে—ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অথবা তারা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র অথবা, ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে বড় অথবা বিজ্ঞান ধর্মের চেয়ে বড়।

যাঁরা বলেন, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাদের মতে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞান উভয়ই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ঈশ্বর প্রদত্ত। উভয় জ্ঞানের যখন উৎস এক, তখন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ থাকতে পারে না। তবে আপাতঃ দৃষ্টিতে যে বিরোধ দেখা যায়, তার কারণ, আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। আমাদের জ্ঞান যদি সম্পূর্ণ ও অসীম হতো, তাহলে আমরা জানতে পারতাম যে,

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাত নেই এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তারা সুসমঞ্জস্য। বাস্তব ক্ষেত্রে, সীমিত জ্ঞান দিয়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ মোচন করা সম্ভব নয়।

অনেকে উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, ধর্ম বিজ্ঞানের অগ্রগতির সহায়ক। পৃথিবীতে কখনও ধর্মপ্রাণ বিজ্ঞানীর অভাব হয়নি। পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান প্রভূত উন্নতি করেছে; তবু সেখানে খ্রীস্টধর্ম প্রচলিত রয়েছে। কাজেই এ দু'য়ের মধ্যে একটা মিল থাকা অসম্ভব নয়।

কতিপয় বিজ্ঞানী ইহুদী বা খ্রীস্টান ছিলেন বলেই যে ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্মকে বিজ্ঞানের সহায়ক বলে ধরে নিতে হবে এই অভিমতের পেছনে যুক্তি নেই। বরঞ্চ খ্রীস্টধর্ম এবং পোপ মধ্যযুগে বিজ্ঞানকে প্রতিরোধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগীয় খ্রীস্টধর্ম বিজ্ঞানের পরিপন্থী ছিল। বিভিন্ন যুগে ধর্ম বিজ্ঞানীদের নিগৃহীত করেছে; ধর্ম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে রদ করতে চেষ্টা করেছে। বিজ্ঞানীরা ধর্মদ্রোহী আখ্যা পেয়েছেন এবং কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ধর্মের বিজ্ঞান বিরূপতার যে ঐতিহাসিক দলিল রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মকে বিজ্ঞানের সঙ্গে সুসমঞ্জস্য বলে মেনে নেওয়া শক্ত।

কেউ কেউ বলেন, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র; তারা নিজ নিজ স্বতন্ত্র পরিমণ্ডলে কাজ করে এবং অন্যের গণ্ডীতে যায় না। কাজেই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে না। বিজ্ঞানের ভিত্তি যুক্তি, ধর্মের মূলে বিশ্বাস। ধর্মীয় বিশ্বাসের পেছনে যে প্রমাণ, তা আসে মনের অন্তস্থ অভিজ্ঞতা এবং ভাবাবেগ থেকে। বিজ্ঞানের সপক্ষে যে প্রমাণ, তা সংগৃহীত হয় বাহ্যিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে। কাজেই বিজ্ঞানের পক্ষে ধর্মীয় বিধান নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করার প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু আধুনিক ধর্ম জীবনের কোনও একটি বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না, জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজের মত ও চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বিজ্ঞান ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে

ব্যক্তি ও সমাজকে প্রভাবিত করে। ফলে আধুনিক ধর্ম বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়; তারা পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কাজেই তাদের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই সংঘাতে উপরহস্ত কে পায়? কেউ কেউ বলেন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতে ধর্মকে বিজ্ঞানের উপরে স্থান দিতে হবে। কারণ ধর্মই সত্য এবং ধর্মের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।

যারা বলেন, ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে বড় সত্য, তারা কোনও প্রমাণ দেন না। মূলত তারা ভাবাবেগ ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করে তাদের মতে পৌঁছেছেন। বিজ্ঞান বলে, মানুষ এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল, ধর্ম তা বলে না—বরঞ্চ ধর্মের বিধান এই ব্যাপারে বিজ্ঞানের সরাসরি বিরোধ। এক্ষেত্রে ধার্মিক বিজ্ঞানের উপর ধর্মকে স্থান দেবেন, কিন্তু তারা কোনও যুক্তি দিতে পারবেন না। এ ধরনের বহু উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, বিজ্ঞানের উপর ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এই দাবীর পেছনে অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রমাণ নেই।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতে, কেউ কেউ বিজ্ঞানকে ধর্মের উপরে স্থান দেন। তাদের মতে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ধর্ম ক্রমশঃই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হচ্ছে, ততই ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর শিকড় নড়ে যাচ্ছে। অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ধর্মীয় বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করা। কাজেই বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাসগুলোর মূল উৎপাটিত হচ্ছে এবং এমন একদিন আসবে, যেদিন দিগ্বিজয়ী বিজ্ঞান ধর্মকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবে, ধর্ম সেদিন দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাবে।

এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, বিজ্ঞান নানা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অসার প্রমাণ করেছে। কিন্তু একথাও মানতে হবে যে, গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের চোখ ধাঁধানো জয়-জয়কার সত্ত্বেও ধর্ম জগৎ থেকে বিলীন হয়ে যায়নি। বিজ্ঞান বিভিন্ন যুগে কতিপয়

ধর্ম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংঘর্ষে এসেছে এবং এই সংঘর্ষ কখনও কখনও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এই সংঘাতের ফলে ধর্মের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে সংপরিবর্তন এসেছে; কিন্তু সম্পূর্ণ ধর্ম বিনষ্ট হয়নি। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধর্ম পরিবর্তন ও পরিশোধনের মাধ্যমে নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আক্রান্ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানগুলোতে পরিবর্তন এসেছে ঠিকই, কিন্তু সমগ্রভাবে ধর্ম টিকে রয়েছে। ধর্ম রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু ধ্বংস হয়নি।

কাজেই বলা যায় যে, বিজ্ঞান কতিপয় ধর্ম বিশ্বাসকে খণ্ডন করতে পারে, কিন্তু সমগ্র ধর্মকে ভ্রান্ত প্রতিপাদন করতে পারে না। বিজ্ঞানের আক্রমণে কোনও একটা ধর্ম দুর্বল হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু নতুন একটা ধর্ম তার স্থান গ্রহণ করে।

মানুষের বাহ্যিক জীবন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রক্ষোভ আছে, ভাবাবেগ আছে। হতাশা, অন্যায়, বৈষম্য প্রভৃতি মানসিক সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান দিতে পারে না। ধর্ম এই মানসিক সমস্যাগুলোকে তুলে ধরে এবং সমাধানের চেষ্টা করে। কাজেই ব্যক্তি ও সমাজজীবনে ধর্মের একটা ভূমিকা আছে।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাত আছে। আবার ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই সমাজে অত্যাবশ্যক ভূমিকা আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিচিত্র ধর্ম

আদিম মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি বিচিত্র। কেউ প্রেত পূজা করে; কেউ পূর্বপুরুষকে দেবতার মর্যাদা দেয়, কেউ গাছপালা আকাশ মাটি, নদ-নদী, জল-বায়ু প্রভৃতি প্রকৃতির অবদানকে পূজা করে।

আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুতে সব শেষ নয় মৃতেরও একটা অস্তিত্ব আছে। মৃত্যুর পরবর্তী অস্তিত্বকে আদিম মানুষ প্রেত বলে চিহ্নিত করে। মানুষ মরলে প্রেত হয়। সকল আদিম সমাজেই প্রেত বিশ্বাস দেখা যায়। সাধারণত, প্রেত মানুষের অনিষ্ট সাধন করে। প্রেত অনিষ্ট-কারক ও বিদ্বেষ-পরায়ণ বিধায় আদিম মানুষ প্রেতকে ভয় করে। এস্কিমোরা প্রেতের ভয়ে সদা তটস্থ এবং নানা আচার পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রেতকে খুশী রাখতে সচেষ্ট। মৃত্যুর পরে তারা মৃতদেহকে সদর দরজা দিয়ে বের করে না, ঘরের পেছন দিকে ছিদ্র করে সেখান দিয়ে মৃতদেহ বের করে এবং ঝটপট ছিদ্রটি বন্ধ করে দেয়। তাদের ধারণা, মৃতের প্রেত দরজা খুঁজে না পেয়ে, ঘরে পুনঃপ্রবেশ করতে পারবে না। কোনও কোনও আদিম সমাজে, যে গৃহে লোক মারা যায়, সে গৃহে কেউ আর বাস করে না কারণ প্রেত ঐ ঘরে আসে এবং ঘরের লোকজনকে জ্বালাতন করে। মৃত্যু পথযাত্রী রোগীকে ঘরের বাইরে নিয়ে রাখা হয়, যাতে ঘরটি ভূতুড়ে ঘর না হয়।

অনেক সমাজে মৃতের সমাধিতে, মৃতের পাশে তার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র রেখে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, মৃতের প্রেত ঐগুলো ব্যবহার করবে এবং জীবজন্তুদের আর বিরক্ত করবে না। অনেক সমাজে মৃতের ভোগের জন্য তার স্ত্রীকে বধ করে একই কবরে মৃতের পাশে রেখে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য প্রেতকে খুশী করা।

সাধারণতঃ, প্রেতগুলো আদিম সমাজের দৃষ্টিতে ঈর্ষাপরায়ণ, তবে উপকারী প্রেত যে নেই তা নয়। মালেনেশিয়ায় পরিবারের শেষ মৃত আত্মীয়ের প্রেতকে পরিবারের রক্ষক মনে করা হয় এবং তার কাজ ঈর্ষাপরায়ণ অন্য প্রেতের হাত থেকে পরিবারকে রক্ষা করা।

প্রেত পূজায় পাত্রের ভেদাভেদ নেই। সাধারণভাবে সব প্রেতই পূজার্হ। মালেনেশিয়ায় সর্বশেষ মৃত আত্মীয়ের মাথার খুলি পরিবারের বাস গৃহের দরজায় লটকানো থাকে। পরবর্তী কেউ মারা গেলে আগের খুলিটি সরিয়ে সেখানে সদ্যমৃত আত্মীয়ের খুলি ঝুলানো হয়।

পূর্ব-আফ্রিকার বাগাণ্ডাদের বিশ্বাস, মানুষ মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেতে পরিণত হয়। প্রেত অশরীরী হলেও মানুষের মতই তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আবেগ এবং অনুভূতি। সে সমাজে নিজ পরিবার এবং গোত্রের একজন সদস্য রূপেই পরিগণিত হয়। তার সমাধিকে ঘিরে একটা মন্দির করা হয় এবং তাকে উপযুক্ত অর্ঘ দেওয়া হয়। যদি তার পরিবার তার সম্পত্তি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তাকে সমুচিত অর্ঘ্য নিবেদন করে, তাহলে প্রেত পরিবারের রক্ষক হিসাবে কাজ করে। কিন্তু যদি তার উত্তরাধিকারীরা তার সম্পত্তির দেখাশোনা না করে এবং তাকে যথাযথ অর্ঘ্য না দেয়, তাহলে প্রেত কুপিত হয় এবং অনিষ্ট সাধন করে এবং উত্তরাধিকারীদের ব্যাধি, দুর্ভাগ্য, এমন কি মৃত্যুর কারণ হয়।

প্রেত দুই বছর পর্যন্ত প্রেত থাকে। দুই বছর পার হয়ে গেলে, সে পরিবার বা গোত্রের নবজাত শিশুর দেহে প্রবেশ করে পুনরায় দেহ ধারণ করে। প্রেত দেহ ধারণ করলে তার সমাধি এবং মন্দিরটিকে আর মর্যাদা দেওয়া হয় না। বাগাণ্ডার মানুষ চিরতরে মনুষ্য সমাজ থেকে বিদায় নেয় না। মৃত্যুর পরে তারা কিছুকাল প্রেতরূপে বিচরণ করে। কিন্তু পরে আবার তারা উত্তর পুরুষের মাধ্যমে দেহ ধারণ করে সমাজে ফিরে আসে।

প্রেত পূজার সকল মানুষ মৃত্যুর পরে প্রেতরূপে পূজিত হয়, কিন্তু এই পূজা চিরস্থায়ী নয়। একেকটি প্রেত একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পূজা পায়। মালেনেশিয়ায় বংশের কেউ মারা গেলে, তার প্রেত

পূজা পায় বটে, কিন্তু পরবর্তী কেউ মারা গেলে, এই শেষোক্ত ব্যক্তির প্রেত তখন পূর্ববর্তী প্রেতের স্থান দখল করে এবং আগের প্রেত আর সম্মান পায় না। বাগাণ্ডা উপজাতিতে একেকটি প্রেত দু'বছর পরে উত্তর পুরুষের মধ্যে পুনরায় দেহ ধারণ করে প্রেতের গৌরব হারায়। কিন্তু কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রেত পুরুষানুক্রমে এবং বংশ পরম্পরায় পূজা লাভ করে। বংশ বা পরিবারের কেউ মারা গেলেও এই প্রেত তার মর্যাদা হারায় না কিংবা উত্তর পুরুষের মধ্য দিয়ে আবার দেহ ধারণ করে না। এই প্রেতগুলো বংশ, গোত্র বা উপজাতির পূর্বপুরুষের প্রেত। প্রত্যেক বংশ, গোত্র বা উপজাতির একজন আদিপুরুষ থাকে, যার থেকে বংশ, গোত্র বা উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে। এই আদিপুরুষ মারা গেলে, তার প্রেত বংশ পরম্পরায় এবং পুরুষানুক্রমে পূজিত হয়। অর্থাৎ বংশ, গোত্র বা উপজাতির পূর্বপুরুষ দেবতার মর্যাদা লাভ করে এবং পুরুষানুক্রমে পূজিত হয়। পূর্বপুরুষ-পূজা কয়েক রকম হতে পারে। আফ্রিকার বান্টু সমাজে প্রত্যেক গোত্রেরই নিজস্ব দেবতা আছে। পূর্বপুরুষের প্রেতই এই দেবতা। এই দেবতা পুরুষানুক্রমে গোত্রের দেবতারূপে বংশ পরম্পরায় পূজা পেয়ে থাকে। কিন্তু এক গোত্রের পুরুষানুক্রমিক পূর্বপুরুষ দেবতাকে অন্য কোনও গোত্র পূজা করে না। প্রত্যেক গোত্রের নিজ নিজ পূর্বপুরুষ দেবতা আছে এবং এক গোত্রের পূর্বপুরুষ অন্য গোত্রের পূর্বপুরুষ থেকে ভিন্ন। পূর্বপুরুষ পূজাকারী সমাজে গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি একাধারে গোত্রপতি ও পুরোহিত। সে পূর্বপুরুষ দেবতার সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং গোত্রের সদস্যদের পক্ষ থেকে সে পূর্বপুরুষের প্রেতের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে। পূর্বপুরুষ দেবতার প্রতিনিধি হিসাবে, গোত্রপতি গোত্রের সদস্যদের জীবন ধারাকে পরিচালিত করে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবতাকে গোত্রের সকল খবরা-খবর প্রদান করে।

প্রত্যেক গোত্র পৃথকভাবে নিজ নিজ পূর্বপুরুষ দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করে এবং পশুবলি দেয়। পূর্বপুরুষ দেবতাকে ঘিরে প্রতি বছর ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয় এবং এইসব অনুষ্ঠানে নাচগান করা

হয়, পশু, এমন কি, নরবলিও দেওয়া হয় এবং যৌথ ভোজের আয়োজন করা হয়।

গোত্রের পূর্বপুরুষ-দেবতা সাধারণতঃ অন্য গোত্রের কাছে দেবতার মর্যাদা পায় না। তবে রাজার গোত্রের পূর্বপুরুষ-দেবতা সকল গোত্রের কাছে পূজা পায়। কারণ রাজার গোত্রের পূর্বপুরুষ এক কালে জীবদ্দশায় সকল গোত্রের সম্মানের পাত্র ছিল এবং মৃত্যুর পরেও সে পূর্বমর্যাদা হারায় না। উপজাতির দেবতা গোত্রের দেবতা এবং রাজকীয় দেবতার উর্ধ্বে। উপজাতির দেবতার নিজস্ব মন্দির আছে এবং তার পূজা অর্চনার জন্য ধর্মযাচক শ্রেণী উপজাতির অর্থে প্রতি-পালিত হয়।

প্রেতপূজায় মৃত্যুর পরে সকল মানুষই প্রেতে পরিণত হয়ে পূজার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পূর্বপুরুষ পূজায় কেবল মাত্র পূর্বপুরুষের প্রেতই দেবতার মর্যাদায় উন্নীত হয়; সদ্যমৃত মানুষের প্রেতকে দেবতা-রূপে পূজা করা হয় না। পূর্বপুরুষের প্রেত হিসাবে পূজা শুরু হলেও কালক্রমে পূর্বপুরুষ দেবতার সঙ্গে তার প্রেতের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং অনেক সমাজে দেবতাকে আর পূর্বপুরুষের প্রেতরূপে কল্পনা করা হয় না।

পূর্বপুরুষ-পূজা সামাজিক রক্ষণশীলতা সমর্থন করে এবং পরিবর্তনের বিরোধিতা করে। পূর্বপুরুষ যে নৈতিক বিধি দিয়ে গেছে, তার পরিবর্তন করার সাহস সমাজের নেই। কারণ পূর্বপুরুষের প্রদত্ত বিধানের রদ-বদল পূর্বপুরুষ দেবতার পক্ষে অসম্মানজনক এবং অবমাননাকর। কাজেই এই ধরনের প্রচেষ্টার শাস্তি দেবতার কোপে ব্যাধি ও মৃত্যু।

আদিম মানুষ শুধু মৃত মানুষের প্রেত এবং পূর্বপুরুষ-দেবতার পূজা করতো না, প্রকৃতিকেও পূজা করতো। প্রকৃতির প্রায় সকল অবদানই আদিম মানুষের পূজার পাত্র ছিল। কৃষিজীবী ও উদ্যানজীবী সমাজে সূর্য, বৃষ্টি এবং ক্ষেতের উর্বরতা দেবতার মর্যাদা পেতো। বৃষ্টির উদ্দেশ্যে নানা আচার অনুষ্ঠান পালিত হতো এবং বৃষ্টিকে আবাহন করে নাচগান করা হতো এবং বৃষ্টিকে নানা নৈবেদ্য এবং বিশেষতঃ নবান্ন নিবেদন

করা হতো। সূর্য আদিম মানুষের ধর্মে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নকে কেন্দ্র করে অনেক আচার-পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন সমাজে সূর্যের জন্য বিশেষ যাচক শ্রেণী ছিল। তারা সূর্যের গতিবিধি লক্ষ্য করতো এবং সেই অনুসারে আচার-পদ্ধতির ব্যবস্থা করতো। ধার্মিক ব্যক্তি প্রতিদিন বিশেষ স্তবস্তুতির মাধ্যমে সূর্যকে অভিবাদন করতো। অনেক সমাজে প্রধান পুরোহিতকে সূর্য বা সূর্যের ভ্রাতা আখ্যা দেওয়া হতো। অনেক সমাজে গোত্রপতি সূর্য ঈশ্বরের মূর্তরূপ বলে পরিগণিত হতো কিংবা সূর্য দেবীর বংশধর বলে নিজেকে দাবী করতো। ফসলের মওসুমে উর্বরতার দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়ার ধর্মীয় ব্যবস্থা সকল আদিম সমাজেই দৃষ্টি গোচর হয়। ক্ষেতে বীজ বপনের আগে উর্বরতার দেবীর উদ্দেশ্যে নানা আচার অনুষ্ঠান করা হতো এবং এইসব অনুষ্ঠান না করে, ক্ষেতে বীজ বপন করা হতো না।

লাতিন আমেরিকার আদিবাসী সমাজে চন্দ্রপূজা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। চন্দ্রপূজার উদ্দেশ্য ছিল, রোগ-ব্যাধি দূর করা। চন্দ্রপূজা অনুষ্ঠিত হতো পূর্ণিমা তিথিতে এবং এই উপলক্ষে বিশদ আচার-পদ্ধতির ব্যবস্থা ছিল।

পলিনেশিয়ায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আকাশ, মাটি, পানি, বৃক্ষ ও বজ্রের দেবতার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে এই সকল নির্দিষ্ট দেবতা ছাড়াও নদী, হ্রদ, ইট, পাথর পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, খাল-বিলের, অসংখ্য ছোট ছোট দেবতা ছিল এবং তাদেরও পূজা দেওয়া হতো।

অনেক ধর্মে অগ্নি বিশেষ দেবতারূপে গৃহীত হয়েছিল এবং আচার পদ্ধতিতে অগ্নির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।

প্রকৃতি পূজার উদ্ভব সম্পর্কে টেলার এবং মেরেট দু'টি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দিয়েছিল। টেলারের মতে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণা থেকে প্রকৃতি পূজার উদ্ভব হয়; আদিম মানুষ মনে করতো যে, প্রকৃতির বিভিন্ন অবদানের আত্মা আছে এবং পূজনীয় প্রাকৃতিক অবদানগুলোতে

প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে বলে আদিম মানুষ সেগুলোকে পূজা করতো। মেরেটের মতে, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা থেকে প্রকৃতি পূজার সৃষ্টি হয়। আদিম মানুষ প্রকৃতির অবদানগুলোতে একটি নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তি আরোপ করে সেগুলোকে পূজা করতো।

আদিম সমাজে অনেক জড়বস্তুকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হতো। কবচ, মাদুলি এবং দামী পাথর আদিম সমাজে সমাদৃত হতো। টেলার বলেন, জড়বস্তুর এই সমাদরের কারণ তার অধিষ্ঠাতা প্রেতাত্মা। টেলারের মতে, আত্মা যেমন দেহে অবস্থান করে, আবার নিদ্রায় দেহ ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ায়; মৃত্যুর পরে প্রেতাত্মা তেমনি ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারে এবং ইচ্ছা করলে জড়বস্তুতে অধিষ্ঠান হতে পারে। চঞ্চল প্রেতাত্মা যখন কোন জড়বস্তুতে প্রবেশ করে, তখন বস্তুটি ভক্তি বস্তুতে পরিণত হয় এবং মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে উঠে। প্রেতাত্মা যদি ভর করে, তাহলে যে কোনও জড়বস্তু ভক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে।

ভক্তিবস্তুবাদ সম্পর্কে টেলারের মতবাদ মেরেট গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে ভক্তিবস্তুর আরাধনার কারণ অধিষ্ঠান প্রেতাত্মা নয়, ভক্তি বস্তুর অন্তর্নিহিত নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। ভক্তিবস্তুটি প্রকৃতপক্ষে নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তির আধার এবং সে জন্যই তার মূল্য।

ভক্তিবস্তুবাদ আদিম মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে জোরদার করেছে। একটি বিমূর্ত ধারণার চেয়ে একটি চাক্ষুষ প্রতিরূপ অনেক বেশী কার্যকর এবং হৃদয়গ্রাহী। ভক্তিবস্তুগুলো ধর্মবিশ্বাসগুলোর বাস্তব প্রতিরূপ এবং ভক্তিবস্তুগুলোকে কেন্দ্র করে আদিম মানুষ বিশ্বাস করবার মনোবল পেয়েছে।

আদিম মানুষ একদিকে যেমন ভক্তিবস্তুকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো তেমনি আবার কতকগুলো বস্তু নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হতো। প্রত্যেক আদিম ধর্মেই বিধি-নিষেধ আছে এবং নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকার বিধান আছে। বিধিনিষেধগুলো অমান্য করলে বিপদে পড়তে হয়।

ইংরেজীতে এই ধরনের বিপদজনক ধর্মীয় নিষেধকে বলা হয় ট্যাবু। ট্যাবু শব্দটি এসেছে পলিনেশিয়া থেকে—অর্থ, নিষেধ। পলিনেশিয়ায় কতকগুলো বস্তু, যথা,নবজাত শিশু, মৃতদেহ বা দলপতির শরীরকে ট্যাবু বা নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। যতদূর সম্ভব ট্যাবু বস্তুর স্পর্শ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। কারণ এগুলোর সংস্পর্শে এলে গুরুতর বিপদ ঘটতে পারে; এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বাস্তবে কিন্তু এইসব নিষিদ্ধ বস্তু বা দেহ সমাজের জন্য বিপদজনক নয়। বিধি নিষেধের পিছনে যে সমর্থন ও ভিত্তি তা একমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রসূত বিধান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পলিনেশিয়ায় মৃতদেহ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। কারণ মৃতদেহ যে স্পর্শ করে, সে নাকি গুরুতর ব্যাধিতে পতিত হয় এবং মারা যায়। এই নিষেধের পেছনে বাস্তবসত্য নেই, এর যা মূল্য, তা ধর্মীয়।

অনেক সমাজে খাদ্য বস্তুতে ট্যাবু থাকে। অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিতে নানা ধরনের জীবজন্তুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। ধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারীর জন্য কতকগুলো বিশেষ খাদ্য নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। গর্ভাবস্থায় এবং সূতিকাগারে স্ত্রীলোকের উপর নানা রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এ অবস্থায় গর্ভিনীর জন্য অনেক পশু পাখীর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এমনকি, অনেক সমাজে গর্ভিনীর জন্য উনুনে রান্না করা বস্তু নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে সদ্যপ্রসূত সন্তান বিপদাপন্ন হয় বলে আদিম মানুষের ধারণা।

ফ্রেজার ট্যাবুকে বলছেন, নেতিবাচক যাদুবিদ্যা। তাঁর মতে ট্যাবুর ধারণার পেছনে যাদুবিদ্যার সূত্র দু'টি কাজ করে। যাদুকরের বিশ্বাস নিষিদ্ধ বস্তু ও অন্য বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ তা বিপদজক এবং অমঙ্গলকর। তাই যাদুকর নিষিদ্ধ বস্তুর সঙ্গে সংস্পর্শ এড়াতে চায়। কারণ নিষিদ্ধ বস্তুর সঙ্গে তার যে কার্যকারণ সম্পর্ক তা যাদুকরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে। আমরা যে যাদুবিদ্যার কথা বলেছি, তাতে যাদুকর এমন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে যে, অভীষ্ট ফল লাভ হয়। আর যদি যাদুকর অনভিপ্রেত ফল পরিহার করতে চায়, তা'হলে সে নেতিবাচক যাদু-বিদ্যা প্রয়োগ করে, সে এমন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে যাতে বিপদ

দূরীভূত হয়। কোনও বস্তুকে নিষিদ্ধ বস্তুরূপে চিহ্নিত করা হয়, এই বিশ্বাসে যে, নিষিদ্ধ বস্তুটির সংস্পর্শ বিপদজনক।

মেরেট ফ্রেজারের মত গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, ট্যাবু ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ এবং বস্তুর অন্তর্নিহিত নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তি বিধি-নিষেধের কারণ। কোনও বস্তুতে যদি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি থাকে, তাহলে বস্তুটিকে নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। অতিপ্রাকৃত দুজ্ঞের্য় ও দুর্বোধ্য। কাজেই অতিপ্রাকৃতের প্রতি আদিম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ভীতিপ্রদ। এই ভীতি থেকেই বিধি-নিষেধের সূচনা। যে বস্তুর মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে তার কাছ থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ। কারণ এই শক্তি অজানা, অচেনা এবং ভীতিপ্রদ।

অতিপ্রাকৃত শক্তিকে মালেনেশিয়ায় 'মানা' বলা হয়। বস্তুর অন্তর্নিহিত মানা, সেই বস্তুতে ট্যাবু আরোপের কারণ। পলিনেশিয়ায় অভিজাত শ্রেণীকে ঈশ্বরের বংশধর মনে করা হতো এবং তাদের মধ্যে 'মানা' আরোপ করা হতো। ফলে এই অভিজাত শ্রেণীর সদস্যদের দেহ নানা বিধি-নিষেধে আবদ্ধ ছিল। পলিনেশিয়ায় পাপাচারকে ট্যাবু করা হয়েছিল এবং এই ট্যাবু অমান্যকারীকে শাস্তি পেতে হতো।

আদিম মানুষের বিচিত্র বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান থেকে বোঝা যায় যে, তাদের ধর্মীয় আচার-পদ্ধতি ও ক্রিয়াকর্ম এবং ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়াগুলো জটিল এবং সেগুলো রপ্ত করতে হলে বিশেষ তালিম দরকার। সকলের পক্ষে তালিম নিয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। তাদের তালিম গ্রহণের সময় নেই, সে মেজাজও নেই। যখন প্রয়োজন পড়ে, তখন তারা আচার-পদ্ধতি ও যাদুবিদ্যার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হয়। তাই প্রত্যেক সমাজে এক শ্রেণীর লোক থাকে, যারা আচার-পদ্ধতি ও যাদু-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। এই ধরনের ধর্ম বিশেষজ্ঞকে সাইবেরিয়ায় শামান বলা হয়। শামান প্রধানতঃ খণ্ডকালীন ধর্ম-বিশেষজ্ঞ। সমাজে ধর্মযাজক শ্রেণীর উদ্ভবের আগে শামানের একচ্ছত্র প্রতিপত্তি ছিল।

সাধারণতঃ শামানরা দাবী করে যে, তারা কোন প্রেতাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শামান ব্রত গ্রহণ করেছে। প্রেতাত্মার দ্বারা আদৃষ্ট

হয়ে, তারা বয়োবৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত শামানের কাছে গিয়ে, প্রেতাত্মার আদেশ বাণী ব্যক্ত করে। শামান তখন তাদের উপর প্রেতাত্মার আহ্বান এসেছে বুঝতে পারে এবং তাদের তালিম দিয়ে শামান করে তোলে। তবে কখনও কখনও বৃদ্ধ শামান স্বেচ্ছায় তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কোনও বন্ধু বা আত্মীয়কে দান করে তাদের শামান করে তোলে।

আদিম মানুষের মতে, শামান অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তারা ঝড় ডেকে আনতে পারে, শিকারের পশুকে শিকারীর হাতের মুঠোয় এনে দিতে পারে, হারানো বস্তু উদ্ধার করতে পারে, প্রেম, ভালোবাসা, যুদ্ধ এবং অ্যাডভেঞ্চারে সাফল্য আনতে পারে, শত্রুর গতিবিধি নির্ণয় করতে পারে। তারা পারে না এমন কাজ নেই।

তবে শামানদের প্রধান কাজ রোগ নিরাময় করা। শামানদের তাই অনেক সমাজে যাদুকর-বৈদ্য বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। রোগ হলে শামানদের ডাক পড়ে এবং সেজন্য শামান দর্শনী নিয়ে থাকে। লোকের কাছে নিজের অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য শামানকে অস্বাভাবিক আচরণ ও কাজ কারবার করতে হয়। উম্মাদ, নর্তন-কুর্দন, বিচিত্র-অঙ্গভঙ্গী ও দুর্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ শামানের ট্রেড মার্ক। তারা ফিটের রোগীর মত নিষ্প্রাণ পড়ে থাকতে পারে, আবার মৃগী রোগীর মত তড়পাতে পারে। তারা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করতে পারে এবং বিকট মুখভঙ্গী করে বিস্ময় উৎপাদন করতে পারে। বস্তুতঃ নিজেদের অক্ষমতা তারা অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী ও কার্যকলাপ দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করে। শামানদের তাই সুস্থ মস্তিষ্ক বলে মনে হয় না; তারা কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ।

আদিম মানুষের ধর্মে ভূতপ্রেত, পূর্বপুরুষ-দেবতা, প্রকৃতি-দেবতা নানা উপদেবতার বাহুল্য দেখে মনে হয়, আদিম মানুষ বহু ঈশ্বরবাদী এবং তাদের মধ্যে পরমেশ্বরের ধারণা নেই। নৃবিজ্ঞানী টেলার বলেন, প্রেতাত্মার ধারণা থেকে শুরু হয়ে প্রেতপূজা, পূর্বপুরুষ-দেবতা ও প্রকৃতি-দেবতা ইত্যাদি বহু ঈশ্বরবাদী বিশ্বাসের স্তর পার হয়ে, মধ্য আধুনিক একেশ্বরবাদের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

টেলারের ধারণার পেছনে ঐতিহাসিক সমর্থন নেই। নৃবিজ্ঞানী ল্যাং পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম সমাজের ধর্মজীবন পর্যালোচনা করে পরমেশ্বরের ধারণার সন্ধান পেয়েছেন। প্রায় সকল আদিম সমাজেই একটা পরম ঈশ্বর, জগৎপিতা বা পরম ব্রহ্মের ধারণা আছে। এ ধারণা খ্রীস্টান, ইহুদী বা আধুনিক কোন একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস থেকে ধার করা নয় এবং প্রেতাত্মার সঙ্গে এই পরমেশ্বরের কোন যোগ নেই। অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে, যে যুগে জগৎপিতা বা পরমেশ্বরের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, সে যুগে খ্রীস্টান পাদ্রীরা অষ্ট্রেলিয়ায় পদার্পণ করেনি। অপরপক্ষে, অনেক অষ্ট্রেলীয় আদিবাসী সমাজের পরমব্রহ্ম মৃত্যের প্রেত নয়; পৃথিবীতে প্রথম মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই, এই পরমেশ্বর জগতে রয়েছেন এবং তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই পরমেশ্বরের ধারণা আদিম মানুষ আধুনিক একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর সংস্পর্শে এসে শিক্ষালাভ করেনি। কোনও প্রেতাত্মার সঙ্গে এই পরমেশ্বরের সম্পর্ক নেই।

আদিম মানুষের মতে, পরমেশ্বর প্রাকৃতিক নয়; তার কোনও আকার নেই। সে জগতের স্রষ্টা এবং তার সৃষ্টি সুন্দর। কিন্তু জগৎ সৃষ্টি করেই আদিপিতা পরমেশ্বর ক্লান্ত হয়েছে; জগতের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহ নিয়ে সে আর মাথা ঘামায় না। মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে সুদূর আকাশে তার বাস এবং নিজের সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে সে একেবারে নির্লিপ্ত। তার কোনও মন্দির নেই, তার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয় না, নৈবেদ্য নিবেদন করা হয় না। তাকে ঘিরে কোনও আচার-পদ্ধতি নেই। কারণ এই নির্লিপ্ত জগৎ স্রষ্টার কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের আশা নেই।

তবে নিজে নির্লিপ্ত হলেও, এই পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহু অধস্তন দেবতা সৃষ্টি করেছে এবং জগতের নিয়ন্ত্রণভার তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে। এইসব অসংখ্য অধস্তন দেবতা নিজ নিজ পরিধিতে জগৎকে চালনা করে। এসব দেবতা নির্লিপ্ত নয়; বরং নিজেদের মর্জাদা ও ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। উপযুক্ত

সমাদর না পেলে তারা মানুষের সর্বনাশ করতে দ্বিধা করে না। কাজেই তাদের নানা আচার-পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট করতে হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বরের চেয়ে উপদেবতার ঠাঁট বেশী। উপদেবতাকে হাত করতে না পারলে অনিষ্টের সম্ভাবনা, ইষ্ট লাভ তো অসম্ভবই। কালক্রমে তাই পরমেশ্বর একটা ক্ষীণ ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে এবং অন্যান্য দেবতা, যেমন পূর্বপুরুষ-দেবতা, প্রকৃতি-দেবতা প্রভৃতি ছোট ছোট দেবতারা মাতব্বর হয়ে বসেছে এবং মানুষের পূজা পেয়েছে।

নৃ-বিজ্ঞানী ল্যাং বলেন, পরমেশ্বরের ধারণা, মানুষের চিরায়ত চিন্তাশক্তির ফলশ্রুতি। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থের তাড়নায়, মানুষের শুভবুদ্ধি পরমেশ্বরের ধারণাকে জিইয়ে রাখতে পারেনি। ব্যক্তিস্বার্থ আদিম মানুষের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে এবং পরমেশ্বরের স্থানে সে নিজের প্রয়োজন মাফিক অসংখ্য দেবদেবীকে বসিয়েছে। ছোট স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, রোগ নিরাময়ের জন্য, শত্রুকে দমনের জন্য, যুদ্ধে বিজয়ের জন্য, অন্যকে বঞ্চিত করে নিজে লাভবান হওয়ার জন্য, মানুষ নানা ছোট দেবতার সৃষ্টি করেছে। পরমেশ্বরের কাছ থেকে ছোট কাজে সহায়তা আশা করা চলে না। কারণ পরমেশ্বর অনেক বেশী বড়, অনেক বেশী মহৎ এবং অনেক বেশী সমদৃষ্টি সম্পন্ন। তাই প্রেত, প্রেতাত্মা, পূর্বপুরুষ-দেবতা, প্রকৃতি-দেবতা সৃষ্টি করে আদিম মানুষ তাদের দিয়ে নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াস পেয়েছে।

যুগে যুগে মনীষীরা এসেছেন এবং তাদের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করে পরমেশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আধুনিক একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো এই প্রচেষ্টার ফল।

পরমেশ্বর কে, এবং পরমেশ্বর কিভাবে জগৎ সৃষ্টি করেছে, আদিম সমাজের পুরা কাহিনীতে, তার বর্ণনা পাওয়া যায়। আদিম সমাজের ঐতিহ্য পুরাকাহিনী ও লোক কাহিনীতে প্রকাশ পায়। অতিপ্রাকৃতকে নিয়ে যেসব কাহিনী, তাকে বলা হয় পুরা কাহিনী। কি করে বিভিন্ন দেবতার সৃষ্টি হলো, কোন দেবতা কি করে, দেবতারা কোথায় থাকে, তারা কিভাবে জীবন যাপন করে, পার্থিব ঘটনাবলীকে তারা কিভাবে

নিয়ন্ত্রিত করে, এইসব কথা কাহিনীর আকারে পুরাকাহিনীতে বর্ণিত হয়। মানব জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ, প্রীতি ভালোবাসা, প্রভৃতি ঘটনা নিয়ে গড়ে ওঠে লোক-কাহিনী। আদিম সমাজে দেবদেবীর এত ছড়াছড়ি যে, মানুষের প্রতি পদক্ষেপে তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। তাই মানুষের সাধারণ ঘটনাগুলোতেও দেবতাদের বারবার সাক্ষাৎ মেলে এবং তাদের বাদ দিয়ে মানব জীবনের কোন কাহিনীই গড়ে উঠতে পারে না। লোক-কাহিনীতে তাই দেবদেবীর কথাও থাকে এবং নির্ভেজাল ধর্মনিরপেক্ষ লোক কাহিনী কদাচিৎ দেখা যায়।

পুরাকাহিনী ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে গল্পের আকারে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। সমগ্র খ্রীস্টান জগতে রবিবার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ছুটির দিন। রবিবারের মাহাত্ম্যের পেছনে একটা পুরাকাহিনী পাওয়া যায়। খ্রীস্টান ধর্ম-পুস্তকের আদি পুস্তক খণ্ডে জগৎ সৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর ছয়দিন ধরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং "পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিন আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। আর ঈশ্বর সেই সপ্তমদিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন।"

উত্তর আমেরিকার ক্রোরেড ইণ্ডিয়ানদের পুরাকাহিনীতে জগৎসৃষ্টির আজব বর্ণনা পাওয়া যায়। আদিতে শুধু পানি ছিল, মাটি ছিল না। কেবলমাত্র হাঁস এবং আদি পিতাই তখন জগতে বিচরণ করতেন। এক দিন আদি পিতা হাঁসদের কাছে গিয়ে বললেন 'ভাইসব, আমরা একা একা আর কতকাল দিনপাত করবো। আমাদের নীচেই তো মাটি আছে"। হাঁসগুলো জলে ডুবে পায়ে পায়ে কাদা নিয়ে এলো। এই কাদা দিয়ে আদি পিতা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি বললেন "আমি মাটি তৈরী করেছি, এখন যারা এখানে বাস করতে চায় তারা আসতে পারে।" বলামাত্র নেক্‌ড়ে বাঘ লাফিয়ে এলো এবং জগতে জীবন্ত জন্তু জানোয়ারের জীবন যাত্রা শুরু হলো।

এমনি অজস্র বিচিত্র পুরাকাহিনীর উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে, যে পুরাকাহিনীগুলো লোক মুখে প্রচারিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একটা আশ্চর্যজনক মূলগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নৃ-বিজ্ঞানী ফ্রেজার বাইবেল বর্ণিত পুরাকাহিনীগুলোর সঙ্গে, আদিম সমাজে প্রচলিত পুরাকাহিনীগুলোর তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, বাইবেল সৃষ্টিতত্ত্ব, মহাপ্লাবন, স্বর্গ থেকে পতন এবং বাইবেলের দুর্গ প্রভৃতি বিষয়ক পুরাকাহিনীগুলোক সঙ্গে আদিম জগতের পুরাকাহিনীগুলোর অনেকাংশে মিল আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

টোটেম ও ধর্মের উৎপত্তি

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী দুরখাইম বলেন, অষ্ট্রেলীয় উপজাতি মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম সমাজ এবং এই আদি সমাজে ধর্মের উদ্ভব হয়।

অষ্ট্রেলীয় উপজাতিতে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে গোত্র। কয়েকটি গোত্র মিলে একটি উপজাতি। গোত্রের সদস্যারা পরস্পরের সঙ্গে যে জ্ঞাতি সম্পর্কে আবদ্ধ তা রক্তের সম্পর্ক নয়। গোত্রের সদস্যদের জ্ঞাতি সম্পর্কের কারণ তাদের সাধারণ নাম। গোত্রের প্রত্যেক সদস্যের নাম এবং গোত্রের নাম একই। গোত্রের প্রত্যেকে নিজেকে এবং গোত্রকে একই নামে পরিচয় দেয় এবং একই নামে ডাকে। উপজাতির যেসব সদস্যের নাম এক, তারা মিলে একটি গোত্র এবং সেই একই নামে গোত্রের পরিচয় এবং গোত্রের সদস্যদের পরিচয়।

গোত্র ও গোত্রের সদস্যদের এই সাধারণ নামটি প্রধানতঃ কোনও জীবজন্তু বা গাছপালার নাম। কোনও গোত্রের নাম ক্যাঙ্গারু, কোনও গোত্রের নাম কাক, কোনটির নাম আবার টিকটিকি। ক্যাঙ্গারু গোত্রের প্রত্যেক সদস্যের নাম ক্যাঙ্গারু, টিকটিকি গোত্রের প্রত্যেক সদস্যের পরিচয় টিকটিকি। সাধারণতঃ গাছপালা ও জীবজন্তুর নামেই গোত্রের নাম। জ্যোতির্মণ্ডলের নামানুসারে গোত্রের নামকরণ বিরল। চন্দ্র বা সূর্য নামের গোত্র খুব কম দেখতে পাওয়া যায়।

যে জীবজন্তু বা গাছগাছড়ার নাম গোত্রের নাম, তাকে বলা হয় গোত্রের টোটেম। ক্যাঙ্গারু গোত্রের টোটেম ক্যাঙ্গারু, টিকটিকি গোত্রের টোটেম টিকটিকি। প্রত্যেক গোত্রের নামকরণ হয়, এক একটি জীবজন্তু বা গাছপালার নামানুসারে। অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্রেরই নিজস্ব টোটেম আছে। দু'টি গোত্রের টোটেম এক হতে পারে না। কারণ যাদের টোটেম এক তারা সবই এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

দুরখাইম বলেন, টোটেম কেবলমাত্র একটি নাম নয়, টোটেম একটি প্রতীক। টোটেম যেমন গোত্রের নাম, তেমনি গোত্রের প্রতীকও বটে। যখন কোনও গোত্র অন্যের সঙ্গে চুক্তিতে আসে, তখন টোটেমের চিহ্ন দিয়ে চুক্তিটিকে শীলমোহর করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঢাল তলোয়ার এবং শিরস্ত্রাণে গোত্রের টোটেম অংকিত থাকে। গোত্রের ব্যবহার্য তাঁবুগুলোতে গোত্রের টোটেমের প্রতিকৃত আঁকা হয়। বাড়ীর দরজায়, ঘরের দেয়ালে, নৌকায় এবং এমনকি বাসন-পত্রেও টোটেমের প্রতিমূর্তি অংকিত করা হয়ে থাকে।

শুধু বাহ্য বাস্তুতেই নয়, টোটেমের প্রতিকৃতি গোত্রের সদস্যরা নিজ নিজ দেহেও ধারণ করে। অনেকে টোটেমের উল্কি নেয় এবং প্রায় সকলেই বিভিন্ন উপলক্ষে নিজের দেহে টোটেমের প্রতিকৃতি হয় খোদিত করে, না হয় অংকিত ও চিত্রিত করে।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলোতে এই প্রতীক বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন টোটেমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন। কোনও টোটেমের সম্পর্কীয় আচার-পদ্ধতি কেবলমাত্র সেই টোটেমধারী ব্যক্তিরাই সম্পাদন করতে পারে। যারা এই আচার-পদ্ধতি সম্পাদন করে, যারা আচারপদ্ধতি পরিচালনা করে এবং যারা দর্শক হিসাবে যোগ দেয়, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেহে টোটেমের প্রতিকৃতি এঁকে নেয়। যে পুরোহিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে, সে এমন একটা পোশাক পরিধান করে, যা পরলে তাকে টোটেমের মত দেখায়। যখন কোনও যুবককে ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়, তখন তার সারা দেহে টোটেমের প্রতীক অংকিত করা হয়। মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটি প্রধান অঙ্গ, মৃতদেহে টোটেমের প্রতীক অংকন।

প্রত্যেক গোত্রের কতকগুলো পবিত্র বস্তু থাকে এবং বিভিন্ন আচার-পদ্ধতিতে পবিত্র বস্তুগুলো ব্যবহৃত হয়। এমন একটি পবিত্র বস্তু হলো 'চুরিঙ্গা'। চুরিঙ্গা প্রকৃতপক্ষে একখণ্ড কাঠ কিংবা এক টুকরো মসৃণ পাথর। আকৃতি ডিম্বাকার। চুরিঙ্গার এক মাথায় ছিদ্র করে মানুষের চুল দিয়ে তৈরী সুতো ঢোকানো থাকে। চুলের দড়ি দিয়ে

চুরিঙ্গাটিকে বেগে ঘোরালে গুণ গুণ শব্দ ওঠে। চুরিঙ্গাগুলোকে অতীব পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। বস্তুতঃ চুরিঙ্গার চেয়ে অধিকতর ধর্মীয় মর্যাদা সম্পন্ন আর কিছু নেই। স্ত্রীলোক এবং ধর্মে দীক্ষা পায়নি, এমন যুবকের চুরিঙ্গা স্পর্শ করা নিষেধ। চুরিঙ্গাকে যথার্থ মর্যাদা ও ভক্তি সহকারে একটি বিশেষ স্থানে রাখা হয়। চুরিঙ্গার স্পর্শে নাকি ক্ষত আরোগ্য এবং রোগ নিরাময় হয়, চুরিঙ্গা মানুষকে নাকি শক্তি, সাহস ও অধ্যবসায় দান করে। চুরিঙ্গার অন্যান্য সাধারণ ক্ষমতার ইয়ত্তা নেই। গোত্রে ধর্মীয় জীবনে এই বস্তুই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। নানাভাবে এগুলোকে তৈল দ্বারা অভিষিক্ত করা হয় এবং চুরিঙ্গাকে ঘিরে পূজা অর্চনা দেয়া হয়।

চুরিঙ্গার উচ্চ ধর্মীয় মর্যাদার কারণ কি ? একটি কাঠের টুকরা বা একটি পাথরের নুড়ির সঙ্গে চুরিঙ্গারূপী কাঠ বা পাথরটির প্রভেদ কোথায় ? প্রভেদ এই যে, একটিতে টোটেমের প্রতিকৃতি অংকিত আছে, অন্যটিতে নেই। চুরিঙ্গার গারে গোত্রের টোটেমের প্রতিকৃতি খোদাই করা থাকে এবং চুরিঙ্গা যে সাধারণ পাথর বা কাঠের টুকরা থেকে আলাদা তার কারণ এর উপর টোটেমের প্রতীক রয়েছে; অন্য পাথর বা কাঠে তা নেই। সুতরাং একথা বলাই বাহুল্য যে, চুরিঙ্গার ধর্মীয় মাহাত্ম্যের কারণ, এই প্রতীক এবং এজন্যই চুরিঙ্গা পবিত্রতা পায়।

তাহলে টোটেম শুধু একটি নাম নয়—টোটেম একটি প্রতীক এবং এই প্রতীক অতি পবিত্র। প্রতীকটি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বহুল ব্যবহৃত হয়। প্রতীকটি নিজে পবিত্র এবং যে বস্তুতে অংকিত বা খোদিত হয়, সে বস্তুটিও পবিত্র! মোটকথা, পবিত্র অপবিত্রের মাপকাঠি এই প্রতীক।

প্রতীকটির ধর্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু যে আসল বস্তুটি গোত্রের টোটেমরূপে গৃহীত হয়েছে, সেই বস্তুটি সম্পর্কে গোত্রের দৃষ্টিভঙ্গী কি ? অনেক গোত্রে টোটেম প্রাণী বা টোটেম বৃক্ষ ভোজন করা নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু সেই প্রাণী বা বৃক্ষকে পূজার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরং অনেক গোত্রে টোটেম প্রাণী বধ করে তার মাংস আহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। টোটেমের

প্রতিকৃতিকে যে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়, আসল টোটেম প্রাণীকে সে মর্যাদা দেওয়া হয় না। স্ত্রীলোক ও ধর্মে দীক্ষাহীন যুবক চুরিঙ্গা স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু টোটেম প্রাণীকে স্পর্শ করতে বাধা নেই। টোটেমের প্রতিকৃতি সম্বলিত চুরিঙ্গাটিকে বিশেষভাবে রক্ষা করা হয়, কিন্তু টোটেম প্রাণীটি যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, তার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় না। বিভিন্ন আচার পদ্ধতিতে চুরিঙ্গা আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু টোটেম প্রাণীটি সেখানে উপেক্ষিত। প্রতীক সম্বলিত চুরিঙ্গাটিকে ঘিরে অদিবাসীরা নৃত্যগীত করে এবং নানাভাবে তাকে প্রণাম জানায়। কিন্তু টোটেম বস্তুটিকে এ ধরনের সম্মান দেওয়া হয় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, টোটেম বস্তুটির চেয়ে টোটেমের প্রতীকটি অধিকতর পবিত্র এবং পূজনীয়।

টোটেম বস্তুটিকে পূজা না করে প্রতীকটিকে পূজা করার সঙ্গত কারণ আছে। অধিকাংশ টোটেম প্রাণীই অকিঞ্চিৎকর। টিকটিকি, আরসুলা, ইঁদুর বা পিঁপড়ের মত তুচ্ছ ও ক্ষীণজীবীকে পূজা দেবার কথা মনে না জাগাই স্বাভাবিক। গোত্রের প্রত্যেকে নিজেকে যে শুধু টোটেম বস্তুর নামে পরিচয় দেয় তাই নয়, নিজেকে টোটেম বস্তু বলেও ভাবে। ক্যাঙ্গারু গোত্রের সদস্য নিজেকে ক্যাঙ্গারু মনে করে মূলতঃ গোত্রের প্রত্যেকে মনে করে যে, সে একাধারে মানুষ এবং টোটেম বস্তু। গোত্রের সদস্যরা যখন নিজেরাই একেকটি টোটেম বস্তু তখন তাদের পক্ষে টোটেম বস্তুটিকে পূজা করার কোনও কথাই ওঠে না। টোটেম বস্তু এবং গোত্রের সদস্য এক এবং অভিন্ন। কাজেই টোটেম বস্তুকে পূজা করা নিজেকে পূজা করার শামিল।

কাজেই গোত্রের প্রতীক যে টোটেমের প্রতিকৃতি, সেই প্রতীকটিকে গোত্র পূজা করতো—টোটেম জন্তু বা বস্তুকে নয়। প্রতীকটিকে পূজা করার কারণ এটি একটি অজ্ঞাত নৈর্ব্যক্তিক শক্তির প্রতীক, যে শক্তি গোত্রকে জীবনীশক্তি যোগায়। ব্যক্তি মরে যায়; কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক শক্তি পুরুষানুক্রমে একটি বাস্তব এবং চিরন্তন শক্তিরূপে গোত্রকে প্রেরণা

দেয়। এই শক্তি অতীত পুরুষকে প্রেরণা যুগিয়েছে; বর্তমানে পুরুষকে প্রেরণা যোগাচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ পুরুষকেও অনুপ্রাণীত করবে। গোত্রের সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক নেই; এই অজ্ঞাত নৈর্ব্যক্তিক শক্তিই গোত্রকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে এবং গোত্রের সদস্যদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে একত্বের অনুভূতি দিয়েছে। গোত্রের প্রতীক টোটেমের প্রতিকৃতিকে পূজা প্রকারান্তরে এই শক্তিরই পূজা। এই শক্তিই হচ্ছে টোটেমীয় গোত্রের ঈশ্বর, দুরখাইম তাকে বলেছেন, টোটেমীয় সত্তা।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে টোটেমের যে মূল্য তা আসলে প্রতীক হিসাবে মূল্য। টোটেম একদিকে টোটেমীয় সত্তা বা ঈশ্বরের প্রতীক, অপরদিকে আবার গোত্রের প্রতীক। অর্থাৎ টোটেমের প্রতিকৃতি একাধারে ঈশ্বর এবং গোত্র উভয়েরই প্রতীক। তাই যদি হয়, তাহলে গোত্র ও ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন হতে বাধ্য। কারণ গোত্র ও ঈশ্বর যদি পরস্পর থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে গোত্রের প্রতীক কি করে ঈশ্বরের প্রতীক হতে পারে? দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রতীক এক হতে পারে না, যদি বস্তু দু'টি এক হয়, তবেই তাদের প্রতীক এক হওয়া সম্ভব। কাজেই গোত্রের ঈশ্বর স্বয়ং গোত্র ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। গোত্রের ঈশ্বরই বস্তুতঃ টোটেমের প্রতিকৃতির মাধ্যমে গোত্রের সদস্যদের সামনে উপস্থাপিত হয়।

গোত্রই গোত্রের ঈশ্বর। কারণ গোত্র তার সদস্যদের মনে ঈশ্বরের ধারণা সঞ্চারের ক্ষমতা রাখে গোত্রের সঙ্গে তার সদস্যদের সম্পর্ক ঈশ্বরের সঙ্গে তার ভক্তের সম্পর্কের অনুরূপ। ভক্তের দৃষ্টিতে, ঈশ্বর ব্যক্তির অনেক উপরে, ব্যক্তির চেয়ে অনেক বড়। প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী এবং তার করুণাপ্রার্থী। প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরে ভরসা করে শান্তি পেতে চায়। গোত্র ও ব্যক্তির চেয়ে বড় এবং ব্যক্তির অনেক উর্ধ্বে। গোত্রের সদস্যরাও নানাভাবে গোত্রের উপর নির্ভরশীল। তারাও তাদের ব্যক্তি জীবনের প্রয়োজনে গোত্রের করুণাপ্রার্থী এবং গোত্রের মুখাপেক্ষী।

যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে ঈশ্বরের প্রভুত্বও স্বীকার করে। কারণ, ঈশ্বর বৃহত্তর শক্তি এবং ঈশ্বরের অনুশাসন অবজ্ঞা করার উপায় নেই।

ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুশাসন মানতে বাধ্য হয়; সে অনুশাসন তার ব্যক্তি স্বার্থ বা প্রবৃত্তির পরিপন্থী হলেও ঐশ্বরিক অনুশাসন অমান্য করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের প্রভুত্ব তাই মানুষের জন্য বাস্তব সত্য।

অপরপক্ষে, গোত্র ব্যক্তির চেয়ে বড় এবং ব্যক্তির চেয়ে বৃহত্তর শক্তি। গোত্রের সদস্যরা পদে পদে গোত্রের কর্তৃত্ব অনুভব করে। গোত্রের কাছে তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছার মূল্য নেই। গোত্রের আচরণ বিধি তাদের মানতেই হয়। গোত্রের আইন-কানুনের কাছে নতি স্বীকার না করে সদস্যদের গত্যন্তর নেই।

কাজেই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ব্যক্তির কাছে যেমন সত্য, গোত্রের কর্তৃত্বও তেমনি সত্য। এই উভয় শক্তির কাছেই ব্যক্তি সমভাবে অধীনতা স্বীকার করে।

কিন্তু ঈশ্বর শুধু প্রভু নন; ভক্তের জন্য তিনি ভরসার স্থলও। বিপদে আপদে, সুদিনে, দুর্দিনে ভক্ত ঈশ্বরকে ডাকে। কারণ সে ঈশ্বরকে করুণাময় জানে এবং ঈশ্বর তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে বলে তার বিশ্বাস। ফলে করুণাময় ঈশ্বরের মহানুভব শক্তিতে আস্থা ভক্তকে বিপদে-আপদে শক্তি ও সাহস দান করে।

অনুরূপভাবে, গোত্রও বিপদে-আপদে ব্যক্তির ভরসাস্থল। বিপদে আপদে, সুদিনে, দুর্দিনে গোত্র ব্যক্তির পাশে এসে দাঁড়ায়। ব্যক্তি গোত্রেরই অংশ এবং তার আশেপাশে তার বন্ধু, আত্মীয়, শুভানুধ্যায়ী গোত্রের অপরাপর সকল সদস্য তার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বিপদে আপদে তারা ব্যক্তিকে সহায়তা দেয়, সাহস ও মনোবল দেয় এবং ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। গোত্রের সঙ্গে এই একত্ববোধ গোত্রের সদস্যদের আপদে-বিপদে শক্তি ও সাহস যোগায়।

গোত্রের এই যে শক্তি, ব্যক্তিকে ঘিরে রয়েছে, যা ব্যক্তির উপর প্রভুত্ব করে এবং আপদে-বিপদে ব্যক্তিতে ভরসা দেয়; যা একাধারে উদ্ধত আবার পরোপকারী সেই শক্তির অস্তিত্ব অনুভব না করে উপায় নেই। গোত্রের সদস্য হিসাবে ব্যক্তির যা কিছু সম্বল তাও গোত্রেরই দান। যে ভাষায় তারা কথা বলে, যে যে উপকরণ তারা ব্যবহার

করে, যে জ্ঞান ও প্রযুক্তি তারা জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, তার কোনটিই একজন ব্যক্তি বা তার সমসাময়িক কোনও ব্যক্তির সৃষ্ট নয়। যে সংস্কৃতি, যে সভ্যতা ব্যক্তি উপভোগ করে, তা পুরুষানুক্রমে গোত্রেরই দান। কাজেই ব্যক্তির ঊর্ধে গোত্রের একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি ব্যক্তি পদে পদে অনুভব করে। ব্যক্তির চেয়ে বড়, কিন্তু ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল, এই শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও পূজার ভাব সৃষ্টি হওয়াতে বিচিত্র কি!

গোত্র যে ঈশ্বরের ধারণা সৃষ্টি করতে পারে, তার যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া গেল। কিন্তু এই ধারণার প্রথম উন্মেষ হলো কিভাবে? অর্থাৎ অষ্ট্রেলীয় সমাজে ধর্মের উদ্ভব হয় কিভাবে?

দুরখাইম বলেন, অষ্ট্রেলীয় গোত্রের জীবন দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি আর্থিক, অপরটি আনুষ্ঠানিক। গোত্রকে তার জীবিকা অর্জন করতে হয়। কেউ শিকার করে, কেউ মাছ ধরে, কেউ বা শস্য সংগ্রহ করে। জীবিকার প্রয়োজনে গোত্রের সদস্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ হয়ে এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ জীবিকা অন্বেষণ করে। এ জীবন কঠোর বাস্তব, এ জীবনে বৈচিত্র্য নেই, নেই হাসি-আনন্দ। একঘেঁয়ে গতানুগতিক এই জীবন। এই কর্ম-কঠোর জীবন কখনও উচ্চ অনুভূতির জন্ম দিতে পারে না।

কিন্তু গোত্রের জীবনের আর একটি ভাগ আছে। বছরের কয়েকটি বিশেষ উপলক্ষে গোত্রের সকল কর্মব্যস্ত সদস্য তাদের জীবিকার অন্বেষণ মুলতবী রেখে একত্রে মিলিত হয়। এই মিলন তাদের মধ্যে প্রাণের চাঞ্চল্য ও মিলনের আবেগ সৃষ্টি করে। আমাদের বর্তমান সভ্যজগতে আমরা দৈনন্দিন কাজের শেষে যখন ক্লাবে, বিয়েতে বা অন্য কোনও উপলক্ষে সবাই একত্রে মিলিত হই, তখন আমাদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। সভ্যতার বেড়ী দিয়ে আমাদের চঞ্চলতাকে আমরা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরে রাখি, তার বাইরে আমরা যাই না। কিন্তু আদিম মানুষের নিজের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না; তাদের ভাবাবেগকে তারা নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে রাখতে শেখে নি। কাজেই

যখন তাদের মধ্যে আনন্দের আবেগ সঞ্চার হয়, তখন তারা খুশীতে ফেটে পড়ে; আবেগের রাশ টেনে ধরে না। আবার যখন দুঃখ আসে বা মৃত্যু আসে, তখন তারা কেঁদে-কেটে মাথা খুঁড়ে চীৎকার করে মেদেনী কম্পিত করে তোলে। কাজেই যখন গোত্রের সদস্যরা নিজেদের কর্মব্যস্ততা থেকে বিশ্রাম নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তারা আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে এবং আনন্দ, স্ফূর্তি ও হৈ-হুল্লোড়ে গা ভাসিয়ে দেয়। হৃদয়ের বাধ ভেঙ্গে যায়; বাধাবন্ধনহীন উন্মত্ত আনন্দ আর উদ্দামতায় তারা ফেটে পড়ে। এই উদ্দামতা প্রকাশ পায় নাচে, গানে, উচ্চ বাদনে এবং প্রবল চীৎকারে। নাচ-গান ও বাজনার মাত্রা যতই বাড়তে থাকে, চিরিঙ্গার আওয়াজ যতই উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে, প্রাণবন্ততা ততই চরমের দিকে ধেয়ে চলে। এই প্রাণ উচ্ছলতার চরম পর্যায়ে, তারা এমন কাজ করে, যা নিষিদ্ধ ও গর্হিত। তারা নিষিদ্ধ যৌণ সম্পর্ক করে, স্বামীরা স্ত্রী বদল করে, সবাই নিষিদ্ধ অজাচারে লিপ্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে আদিম মানুষের আবেগ শুধু কল্পনা করা চলে, বর্ণনা করা যায় না। আনন্দের আতিশয্যে অনেকে অজ্ঞান হয়ে ভূমিতে ঢলে পড়ে।

এই প্রাণবন্ততা ও অজাচার দৈনন্দিন জীবন থেকে একেবারে পৃথক ও বহু দূরে, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই, সাদৃশ্য নেই। ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে এমন প্রাণবন্ততা, এমন অজাচার অপ্রত্যাশিত এবং অচিন্তনীয়। ব্যক্তি যদি নিজের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হতো, তা'হলে এমনটি কিছুতেই হতে পারতো না। নিশ্চয়ই ব্যক্তি নিজেকে আর নিজে নেই, সে নিজেকে হারিয়া ফেলেছে; নিশ্চয়ই অন্য কোনও শক্তি তাতে সঞ্চারিত হয়েছে এবং এই অব্যক্ত দুর্জ্ঞেয়, নৈর্ব্যক্তিক শক্তিই তাকে দিয়ে এমন কাজ করিয়েছে; যে কাজ সে স্বেচ্ছায় কখনও করতো না। এই প্রাণ উচ্ছল পরিবেশে আত্মহারা আদিম মানুষ একটা নৈর্ব্যক্তিক উচ্চতর শক্তির স্পর্শ অনুভব করে; এই শক্তি যে তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাকে অন্য একটা জগতে নিয়ে গেছে, যে-জগতের সঙ্গে তার প্রতিদিনের গতানুগতিক জগতের কোনও মিল নেই।

গোত্রের সম্মিলিত অনুষ্ঠানে সমবেত প্রাণবন্ততার মধ্যে ব্যক্তি এই নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তির ধারণা উপলব্ধি করে। কাজেই আদিম মানুষ এই শক্তিকে গোত্রের শক্তি বলে ধারণা করে। এইভাবেই গোত্রের সম্মিলিত প্রাণবন্ততা থেকেই ঈশ্বরের ধারণার উৎপত্তি হয়।

তবে প্রশ্ন ওঠে, টোটেমের প্রতীক কি করে ঈশ্বররূপে গৃহীত হলো? দুরখাইম বলেন, দু'টি কারণে টোটেমের প্রতীক ঈশ্বরের প্রতিরূপে পরিণত হয়েছে। প্রথমতঃ, অষ্ট্রেলীয় উপজাতীরা শিকারী। শিকার গোত্রের প্রধান উপজীবিকা। ফলে জীব-জন্তুর সঙ্গে গোত্রের যোগ নিবিড় এবং প্রাণ ধারণের অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে জীব-জন্তুর স্থান সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আবার জীব-জন্তুই গোত্রের টোটেম। কাজেই টোটেম যে নৈর্ব্যক্তিক শক্তির আধাররূপে চিত্রিত হবে তাতে বিচিত্র কি!

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ একটা বিমূর্ত ভাবের চেয়ে একটা বাস্তব প্রতীককে সহজে বুঝতে এবং গ্রহণ করতে পারে। আমাদের অনুভূতি প্রায়শঃই প্রতীকের সাহায্যে বিকশিত হয়। শোকের প্রতীক কালো। শোকে আমরা কালো কাপড় পরি। কালো বর্ডার দিয়ে শোকের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এখানে শোকের অনুভূতিকে কালোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে; কারণ কালো, শোকের প্রতীক।

অষ্ট্রেলীয় গোত্রে টোটেম একটি প্রতীক। টোটেম গোত্রের প্রতীক। গোত্র একটি বিমূর্ত ধারণা, কিন্তু প্রতীকটি বাস্তব এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য। গোত্র জটিল, তার পরিধি ব্যাপক, গোত্রের নানা শাখা-প্রশাখা এবং গোত্রের নানা ব্যাবস্থা ও অনুশাসন জটিল দৃঢ়বদ্ধ। সমগ্রভাবে গোত্রের ধারণা করা তাই কঠিন। বিশেষ করে, আদিম মানুষের স্বল্পবুদ্ধি দিয়ে একটি বিমূর্ত ভাবকে বোঝা ও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু গোত্রের প্রতীকটি সত্য এবং বস্তুনির্ভর। টোটেম প্রাণীটিকে সবাই দেখেছে, তার প্রতিকৃতি সকলের মনে এবং দৃষ্টিতে স্পষ্ট ও জটিলতাবর্জিত। স্বভা-বতঃই, গোত্র মানুষের মনে ঈশ্বরের যে অনুভূতি সৃষ্টি করে, তা বাস্তব এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য টোটেম প্রতীকটির মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে। যে অনুষ্ঠানে সমবেত প্রাণবন্ততার ফলে ধর্মের অনুভূতি জন্ম নেয়, সে অনুষ্ঠানে টোটেমের প্রতীকটি নানাভাবে উপস্থিত। প্রত্যেক ব্যক্তির দেহে টোটেমের প্রতীক মুদ্রিত, যে সকল পবিত্র বস্তু এই অনুষ্ঠানে

ব্যবহৃত হয়, তাতেও প্রতীকের চিহ্ন, চুরিঙ্গাগুলিতে টোটেমের প্রতীক ক্ষোদিত বা অংকিত। চারিদিকের সকল সাজ-সজ্জায় টোটেমের প্রতীকের ছাপ। এই পরিবেশে গোত্রের সদস্যদের কাছে টোটেমের প্রতীকটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তির উৎসরূপে প্রতীয়মান হয়। তা'ছাড়া অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়, প্রাণচাঞ্চল্য ঝিমিয়ে পড়ে। গোত্রের সদস্যরা জীবিকার সন্ধানে ফিরে যায়। কিন্তু টোটেমের প্রতীকটির মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক শক্তি ধারণা বেঁচে থাকে। এক অনুষ্ঠানের পর থেকে অপর অনুষ্ঠান পর্যন্ত টোটেমের প্রতীকটিই নৈর্ব্যক্তিক শক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখে। পুরুষানুক্রমে মানুষ আসে যায়, কিন্তু টোটেম মৃত্যুহীন, টোটেম শাশ্বত। টোটেমই গোত্রের একমাত্র চিরস্থায়ী এবং চিরায়ত শক্তি—যা কখনও বিনষ্ট হয় না, কখনও লোপ পায় না। কাজেই টোটেম যে ঐশ্বরিক শক্তিরূপে উপস্থাপিত হবে, তাতে সন্দেহ কি ?

দুরখাইমের মতবাদ ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় যুগান্তর এনেছে এবং বহুভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে গোত্র তথা সমাজের নিবিড় যোগসূত্র, এমন করে আর কেউ দেখিয়ে দেন নি। ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে অন্যান্য মতগুলো ধর্মের গোত্র-চরিত্রকে অবহেলা করেছে ! কিন্তু সমাজ তথা গোত্রকে বাদ দিয়ে ধর্মের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ধর্মের সঙ্গে সমাজে যোগ নিবিড়। ধর্ম মূলতঃ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তবে ধর্ম ও সমাজ এক নয়। কিন্তু দুরখাইম ধর্ম ও সমাজের যোগ দেখতে গিয়ে দুটোকে এক করে ফেলেছেন। সমাজ ধর্মের চেয়ে ব্যাপকতর। সমাজের পরিধি ও ক্রিয়াকলাপ ধর্মকে ছাড়িয়ে গেছে। এক কথায় সমাজ শুধু ধর্মীয়ই নয়, ধর্ম নিরপেক্ষও বটে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দুরখাইমের মতবাদের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু দুরখাইমের মতবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, অষ্ট্রেলীয় আদিবাসী পৃথিবীর প্রাচীনতম সমাজ। কাজেই তাদের ধর্মই প্রাচীনতম ধর্ম। কিন্তু ইতিহাস তার সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে না। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম সমাজের

চেয়ে প্রাচীন সমাজ আছে। নৃবিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবীর অনেক আদিম সমাজ অষ্ট্রেলীয় আদিম সমাজের চেয়ে প্রাচীনতম। এইসব সমাজে টোটেম নেই, পৃথিবীর অনেক আদিম সমাজে টোটেমের দেখা মেলেনা। কাজেই টোটেম পূজাকে আদি ধর্ম বলে মেনে নেওয়া চলেনা। ঐতিহাসিক ভিত্তিতে টোটেম পূজা পৃথিবীর প্রথম ধর্ম নয়।

দুরখাইমের মতবাদ নিখুঁত নয়। বস্তুতঃ ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনও মতবাদ নিখুঁত নয়। কিন্তু দুরখাইমের মতবাদকে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর সর্বপ্রধান কৃতিত্ব, ধর্মের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনায় তিনি একটি নতুন দিকদর্শন দিয়েছেন। ধর্মের সংগঠন, আচারপদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে তিনিই প্রথম বিজ্ঞান সম্মত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। তাঁকে তাই ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার পথিকৃৎ বলা চলে।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্ম ও সমাজ

সমাজের জন্য কতিপয় কার্মিক পূর্ব-প্রয়োজন আছে; এগুলোর অভাব হলে সমাজ বাঁচে না। চাকা ছাড়া সাইকেল চলেনা; চাকা সাইকেলের কার্মিক পূর্ব-প্রয়োজন। সমাজের কার্মিক পূর্ব-প্রয়োজন-গুলোর মধ্যে ধর্ম অন্যতম।

ধর্মকে যদি সমাজের কার্মিক পূর্ব-প্রয়োজন বলে গন্য করা হয়, তাহলে ধর্মের আলোচনা সমাজবিজ্ঞানের আওতায় এসে পড়ে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সমাজের সঙ্গে ধর্মের যোগ নিবিড়। সমাজের সঙ্গে আবার সংস্কৃতির গভীর সংযোগ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে তার ধারক ও বাহক মানবগোষ্ঠী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফলে ধর্মের সঙ্গে যে শুধু সমাজেরই যোগসূত্র তাই নয়, ধর্মের সঙ্গে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক।

সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা, তার শ্রেণী বিভাগ, অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ, সমাজের রাজনৈতিক সমস্যা ও সংগঠন, জ্ঞাতি সম্পর্ক, এমনকি পরিবার ও বিবাহপ্রথা এবং সামাজিক সৌন্দর্যবোধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানকে প্রভাবিত করে এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ধর্ম প্রবর্তক ইতিহাসে নতুন অভ্যুদয় রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে বটে; কিন্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তাঁরা নিজ নিজ সমাজ ও সংস্কৃতির ছাপ মুছে ফেলতে পারেন নি এবং তাঁদের চিন্তাধারায় তাদের সম-সাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে। সামাজিক ধরণ পরিবর্তিত হলে ধর্মের রূপেও পরিবর্তন আসে। আবার একটা সমাজে যখন কোনও নতুন ধর্ম শিকড় গাড়ে, তখন সেই নতুন ধর্মের প্রভাবও সমাজের উপর পরিলক্ষিত হয়।

সমাজ নিয়েই সমাজ বিজ্ঞানীর কারবার। কাজেই সমাজবিজ্ঞানী ধর্মের উপর সমাজ, সংস্কৃতি ও ব্যক্তির প্রভাব এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও ব্যক্তির উপর ধর্মের প্রভাব আলোচনা না করে পারেন না। তবে তিনি আলোচনা করেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। একটি বিশেষ ধর্ম সমাজ, সংস্কৃতি বা ব্যক্তির প্রতি তার আসক্তি নেই। ইতিহাস থেকে তিনি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন এবং বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে তিনি সেগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করেন।

কেউ কেউ বলেন, ধর্ম সমাজের সংহতির সহায়ক। ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-পদ্ধতি, ধর্মীয় প্রতীক ও ধর্মস্থানের মাধ্যমে ধর্ম সমাজকে সংহত করে এবং মানুষকে একটা অতীন্দ্রিয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সমাজের কর্তৃত্ব সহজভাবে মেনে নেবার প্রেরণা যোগায়। আদিম সমাজে বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, যেমন জমি, গৃহপালিত পশু, বৃষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিবার, গোত্র বা রাষ্ট্র, এ সবগুলোরই রক্ষাকবচ ধর্ম। দৈনন্দিন কর্মমুখর জীবনে ব্যক্তি নিজ নিজ ব্যক্তিগত এবং শ্রেণীগত স্বার্থ সাধনেই ব্যস্ত, তার মনে সমাজের সাধারণ স্বার্থের চিন্তা তখন তেমন জোরালো নয়। ধর্মীয় উৎসব ও আচার-পদ্ধতি সমাজের যৌথ জীবনের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

দুরখাইমের মতে, সমাজ বা গোত্রই ঈশ্বর। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-পদ্ধতি সমাজকেই নিবেদন করা হয় এবং এইসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তি গোত্রের কর্তৃত্ব অনুভব করে এবং স্বীকার করে। কাজেই ধর্ম সামাজিক একতার একমাত্র রক্ষাকবচ।

সমাজের সংহতি বিধান এবং সংহতি রক্ষার জন্য ধর্মের প্রয়োজন কেন? মানুষ যদি স্বভাবগতভাবে সমাজবদ্ধ জীব হয়, তবে সমাজ স্বতঃসিদ্ধভাবে সংহত হতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তবে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে নিরন্তর সংঘাতে লিপ্ত। মানুষ আত্ম-সচেতন, স্বার্থপর এবং আত্ম উন্নতিতে তৎপর। নিজের স্বার্থোদ্ধার মানুষের প্রধানতম লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে নিজের পছন্দসই মূল্যবোধ গড়ে তোলে। ব্যক্তির নিজ স্বার্থ তখন অন্যের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। কেউ আশাহত

হয়, আবার কাউকে বঞ্চিত করে, কেউ আশাতীত লাভ করে। অন্যকে দুঃখ দিয়ে কেউ-বা নিজের সুখ নিশ্চিত করে। অন্যের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, কেউ উন্নতির উচ্চশিখরে উঠতে চেষ্টা করে। ফলে পরস্পরের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নিজ নিজ স্বার্থে মগ্ন থাকলেও ব্যক্তি সমাজজীবন পছন্দ করে। নিজের স্বার্থ বজায় রেখে সে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে চায়। মানুষের মধ্যে একাধারে দু'টি পরস্পর বিরোধী প্রকৃতি কাজ করে—সমাজ জীবনের স্পৃহা এবং ব্যক্তি স্বার্থ চিন্তা। মানুষ নিজের স্বার্থ বজায় রেখে সমাজ-জীবন যাপনে আগ্রহী।

সমাজকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যেতে হলে সংঘাত যতদূর সম্ভব এঁড়াতে হবে, ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তাকে সংযত করতে হবে। অর্থাৎ এমন একটা মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা এবং আশা ও হতাশার সংঘাত সত্বেও ব্যক্তি সেই মূল্যবোধ মেনে নেয় এবং ব্যক্তি-স্বার্থ ও সমাজিক স্বার্থ এই দুই পরস্পর বিরোধী প্রভাবের মধ্যে ভার-সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের সমাজে এমন সব মূল্যবোধ রয়েছে, যা সবারই গ্রহণযোগ্য এবং যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছে। আমরা চুরি করি না, সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত পথে জীবিকা অর্জন করি। আমরা নিরন্তর অপরিচিত ক্রেতা বা বিক্রেতার সঙ্গে কেনা-বেচা করছি, কিন্তু কেউ কাউকে প্রতারিত করতে চেষ্টা করি না। বরং কতকগুলো ব্যবসায়িক মূল্যবোধ সবাই মেনে চলি। কে সমাজকে এই মূল্যবোধ দিয়েছে, যার ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাত সত্বেও সামাজিক সংহতি বজায় আছে?

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, আমরা চুরি করি না, তার কারণ মূল্যবোধ নয়, তার কারণ শাস্তির ভয়। চুরি করলে দণ্ড হবে, সেই ভয়েই চুরি করি না। কিন্তু মূল্যবোধ যদি না থাকে, তবে যে সাজা দেবে, তাকে ঠেকাবে কে? সাজা দেবার ক্ষমতা যার, সে যে ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না, নিজের সুবিধামত তার জবরদস্তি খাটাবে না, সে নিশ্চয়তা কোথায়? ক্ষমতা যত বেশী হবে, তার অপব্যবহার তত বাড়বে। কাজেই এমন একটা ব্যবস্থা দরকার, যার ফলে সমাজ-

বিরোধী শক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণে থাকবে, অথচ জবরদস্তির প্রয়োজনীয়তা যতদূর সম্ভব কম হবে এবং ক্ষমতা প্রয়োগকারী ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ পাবে না। অর্থাৎ সমাজের সংহতি রক্ষার জন্য সকলের গ্রহণযোগ্য সাধারণ মূল্যবোধ প্রয়োজন।

আদিম সমাজে ধর্ম এই মূল্যবোধ যুগিয়েছে। আদিম সমাজে বিধিবদ্ধ আইন ব্যবস্থা নেই। ধর্মই সমাজের মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। ধর্মীয় আচার-পদ্ধতির প্রকাশ্য অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে সামাজিক অনুশাসন প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে ধর্ম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখে। আদিম সমাজে ধর্ম সামাজিক প্রথা ও ঐতিহ্যের একমাত্র রক্ষাকবচ। পুরুষানুক্রমে ধর্মই সমাজের মূল্যবোধকে তার ঐতিহ্য ও প্রথার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাখে। মৃত্যু, ভয়, হতাশা, জীবিকার সংগ্রাম প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম সমাজের একত্ববোধকে জাগরুক রাখে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের নানা সন্ধিক্ষণে, যেমন মৃত্যু, ব্যাধি, বিবাহ, মন্বন্তরে, ধর্ম সকলকে বিশ্বাসের একতা দেয় এবং বিপদাপন্ন ব্যক্তি ও সমাজকে ভেঙ্গে পড়তে বাধা দেয়।

ব্যক্তির ঐহিক আত্ম-স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টার সামনে ধর্ম পারত্রিক মোক্ষলাভের সম্ভাবনা তুলে ধরে। ফলে ব্যক্তি আত্মস্বার্থের সঙ্গে পারত্রিক মোক্ষের একটা আপোষ করে এবং স্বার্থসিদ্ধির তীব্রতা হ্রাস পায়। যাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না, জীবন যুদ্ধে যারা অন্যের পেছনে পড়ে রইলো, ধর্ম পারত্রিক লাভের ভবিষ্যৎ আশা দিয়ে তাদের ইহলৌকিক হতাশাকে লাঘব করে। একটি গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টাকে হ্রাস করে এবং আশাহতের বেদনা লাঘব করে, ধর্ম সমাজকে সংহত করে।

ধর্মের সংহতি সাধনের ক্ষমতা আদিম সমাজে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আদিম সমাজে ধর্ম ও সমাজ অভিন্ন। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব ধর্ম আছে এবং সমাজের প্রত্যেক সদস্য একই বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতিতে আস্থাবান। ফলে ধর্মের প্রধানতম কর্মই হচ্ছে সমাজকে একতাবদ্ধ করা এবং সামাজিক সংহতিকে সংরক্ষণ করা।

কিন্তু আদিম সমাজ থেকে মানুষ অনেক পথ এগিয়ে এসেছে। সমাজের রূপ বদলেছে, জটিলতা বেড়েছে। ধর্মের রূপ ও প্রকৃতি আর অপরিবর্তিত নেই। ধর্ম আজ আর গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আজকের ধর্মের মূলমন্ত্র সার্বজনীনতা। আজকের বৃহৎ সমাজে ধর্ম একটি নয়, একাধিক। যে সমাজে একাধিক ধর্ম প্রচলিত, সে সমাজের সংহতি সাধনের ক্ষমতা ধর্মের কতটা, তা বিতর্কের বিষয়। একাধিক ধর্ম সম্বলিত সমাজে ধর্মের সংহতি সাধনের ক্ষমতা লোপ না পেলেও হ্রাস পেতে বাধ্য।

আদিম সমাজ একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এক সমাজের আচার-ব্যবহার অন্য সমাজকে প্রভাবিত করতো না। কিন্তু আজকের সমাজগুলো পরস্পর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, তাদের মধ্যে যাতায়াত ও ভাব বিনিময় আছে। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে যদি যাতায়াত ও ভাব বিনিময় শুরু হয়, তাহলে বাইরের প্রভাব সমাজের সদস্যদের উপরে না পড়েই পারে না। ফলে ধর্ম সকল সদস্যকে একটা সাধারণ মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম না-ও হতে পারে। বিভিন্ন সমাজের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ফলে ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাসের আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়। যে প্রথা ও ঐতিহ্য অতীতে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সেই প্রথা ও ঐতিহ্য পরবর্তী পুরুষকে উদ্দীপ্ত না-ও করতে পারে। কারণ বাইরের সমাজের সংস্পর্শে এসে এই পুরুষের মূল্যবোধ বদলেছে।

অতীতে সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য ছিল এবং ধর্ম তাকে সমর্থন করেছে। কিন্তু তাতে ধর্মের সংহতি বিধানের ক্ষমতা নষ্ট হয় নি। কিন্তু বর্তমান জগতে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের বিকাশ ঘটেছে। অর্থ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অসমতা সম্পর্কে ধর্মীয় ব্যাখ্যা এখন আর সার্বজনস্বীকৃত নয়। ফলে অর্থ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদা-উদ্ভূত শ্রেণী বৈষম্য সমাজে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রভাব সৃষ্টি করে, ধর্ম তাকে রোধ করতে পারছে না।

কাজেই আদিম সমাজে ধর্ম সমাজকে সংহত করতে সক্ষম ছিল বটে, কিন্তু বর্তমান সমাজে ধর্মের সংহতি সাধক ভূমিকা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে : ধর্ম আদিম সমাজকে যে সংহতি দিয়েছে, তা কি মঙ্গলকর? ধর্মের সংহতি বিধানের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় সমাজ কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

সমাজের সংহতি রক্ষায় ধর্মের ভূমিকা সর্বদা মঙ্গলকর নয়। অনেক সমাজে ধর্ম ক্রীতদাস প্রথা সমর্থন করেছে এবং এই প্রথার ভিত্তিতে সমাজকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ধর্ম যে-প্রক্রিয়ায় সমাজকে সংহত করতে চেষ্টা করে, তা মানবিকতার দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে বর্বরতার নামান্তর। যেমন, ধর্ম কোনও কোনও সমাজে নরবলিকে সমর্থন করছে। এ ধরনের সংহতিকে প্রকৃত সংহতি বলা চলে না। ধর্ম সামাজিক সংহতি বলতে যা বুঝিয়েছে তা' ক্ষেত্রবিশেষে অযৌক্তিক নিয়মানুবর্তীতার নামান্তর। সংহতির অর্থ যদি হয় একটা শক্তিশালী শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা এবং একতার নামে সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে দমন করা, তা'হলে সে সংহতি সমাজের জন্য মঙ্গলকর হতে পারে না। বরঞ্চ এমন সংহতিকে সামাজিক উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এ ক্ষেত্রে ধর্ম একটা শোষক শ্রেণীর হাতের ক্রীড়নক এবং সমাজের সৃজনশীল প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পরিপন্থী। ধর্ম এখানে মানুষের সৃষ্টিধর্মী মানসিকতাকে অবরুদ্ধ করে সামাজিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে।

কার্ল মার্ক্স বলেছেন, ধর্ম মানুষকে তন্দ্রাবিষ্ট করে রাখে অর্থাৎ সামাজিক সংহতির দোহাই দিয়ে ধর্ম শোষিত শ্রেণীকে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা থেকে বিরত রাখে। ফলে শোষিত শ্রেণী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে না; বরং ধর্মীয় অনুশাসনে বিশ্বাস করে শোষক শ্রেণীর শোষণ মেনে নেয়। এই সংহতি সামাজিক মঙ্গলকর এবং সকলের গ্রহণযোগ্য কোনও সাধারণ মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানে একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে সৃষ্ট মূল্যবোধ, ধর্ম সংহতির দোহাই দিয়ে সমগ্র সমাজের উপর আরোপ করে। এই সংহতি সমাজের জন্য মঙ্গলকর নয়; এবং সামাজিক উৎপীড়নের হাতিয়ার।

ধর্মের সংহতি সাধক ক্ষমতা ব্যাহত হওয়ার কারণ, ধর্ম ও সমাজ উভয়ই বদলে গেছে। কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম ও সমাজের রূপ বদলাচ্ছে। ধর্মীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক কি ?

ধর্মীয় পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক হতে পারেঃ ধর্মীয় পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের ফল, ধর্ম সকল পরিবর্তনের পথে প্রতিবন্ধক; ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনের পথিকৃৎ। প্রথমটিতে সামাজিক পরিবর্তন ধর্মীয় পরিবর্তনের সূচনা করে, পরের দু'টিতে ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সমাজের রূপ বদলালে ধর্মের রূপ বদলায়। যাঁরা ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার, তারাও স্বীকার করেন যে, ধর্মের বিশ্বাস, আচার-পদ্ধতি ও সংগঠন সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সামাজিক পরিবর্তন ধর্মে প্রতিফলিত হয়। তবে তাঁরা দাবী করেন যে, ধর্মের পরিবর্তনগুলো শুধু বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন; ধর্মের মৌল অন্তর্নিহিত আদর্শ পরিবর্তিত হয় না। ধর্মের মৌল বিশ্বাস অপরিবর্তনীয়। কারণ এই বিশ্বাস একটা পরম ব্রহ্মের অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক পরিবর্তনে এই পরম ব্রহ্ম অটল ও অনড়।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের ধর্ম জীবনে বিপ্লব আসে। পোপের কর্তৃত্বাধীনে খ্রীস্টধর্ম তার একত্ব হারিয়ে ফেলে এবং ইউরোপীয় খ্রীস্ট ধর্ম বিভিন্ন ছোট ছোট সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নতুন সৃষ্ট সম্প্রদায়গুলো পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। ষোড়শ শতাব্দীর এই ধর্মবিপ্লব রিফরমেশন নামে পরিচিত। রিফরমেশনের পূর্বে ইউরোপের সমাজ জীবনে বিপ্লব এসেছিল এবং সমাজের সর্বস্তরে নানা পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ইউরোপীয় রিফরমেশন মূলতঃ সামাজিক বিপ্লবেরই ফল। আমেরিকায় যখন ইউরোপ থেকে দলে দলে লোক গিয়ে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে সমগ্র মহাদেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন এই উঠতি নতুন সমাজের প্রয়োজনে ছোট ছোট ধর্মমতের সৃষ্টি হয় এবং কালক্রমে সেগুলো একেকটি গির্জায় পর্যবসতি হয়।

এতো গেল আধুনিক কালের কথা। সুদূর অতীতে ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। ইহুদী ধর্ম একটি উপজাতির ধর্ম হিসাবে শুরু হয়েছিল। এই উপজাতির ধর্মে বহু দেবতা ছিল এবং ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে যাদুবিদ্যা জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহুদী ধর্ম একেশ্বরবাদী হয়ে পড়ে এবং ইহুদীদের ঈশ্বর আর শুধুমাত্র উপজাতির ঈশ্বর থাকে না, সার্বজনীন ঈশ্বরে পরিণত হয়। ইহুদী ধর্মের এই যে ক্রম-বিবর্তন তার পেছনে রয়েছে ইহুদী সমাজ-ব্যবস্থার উত্থান ও পতনের ইতিহাস। ইহুদী সমাজ-ব্যবস্থা নানা অবস্থার চাপে এবং বিভিন্ন সমস্যার পীড়নে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল এবং এই সামাজিক পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছিল ধর্মীয় পরিবর্তনে।

ইহুদী সমাজে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এবং খ্রীস্টের মতবাদ তৎকালীন ইহুদী সমাজের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু খ্রীস্টধর্ম ইহুদী সমাজে সীমাবদ্ধ থাকেনি; যতই বাইরের জগতে ছড়িয়ে পড়েছে ততই খ্রীস্টধর্ম ইহুদী সমাজ ব্যবস্থার পটভূমিকা থেকে সরে এসেছে এবং ধর্মের সেই প্রারম্ভিক বিশুদ্ধতা বজায় থাকে নি। খ্রীস্টধর্ম যে নতুন সমাজে প্রচারিত হয়েছে, সেই সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তাই খ্রীস্টধর্মে রোমান আচারোৎসরের প্রভাব দেখা যায়। রোমান সমাজ-ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে খ্রীষ্টধর্মের অনেক আচার পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টান জগতে সর্বশক্তিমান পোপের উদ্ভব ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রতিফল।

ইউরোপীয় রিফরমেশনের ফলে খ্রীস্টধর্মে যে নতুন নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়; রক্ষণশীল রোমান ক্যাথলিক গির্জাও পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার চাপে পড়ে নিজের মতবাদের সংস্কার করতে বাধ্য হয়েছে। রোমান ক্যাথলিক গির্জা অবশ্য প্রথম দিকে সকল সামাজিক পরিবর্তনকে রোধ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু অবশেষে সামাজিক পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার আশ্চর্য প্রবণতা দেখিয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনের ডাকে ধর্মের সাড়া অবশ্য বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রকম। ধর্ম কখনও অতি দ্রুত পরিবর্তন মেনে নেয়; কখনও মানতে চায় না। ধর্মের প্রতিক্রিয়া দ্রুত হোক কিংবা মন্থর হোক, ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনকে উপেক্ষা করতে পারে না।

ধর্ম যে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, এ-সত্য সহজেই প্রমাণ করা চলে। কিন্তু ধর্ম সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করে, তার আলোচনায় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব দু'রকম হতে পারে: ধর্ম সমাজের পরিবর্তনের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে, কিংবা ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনের উদ্যোক্তা হতে পারে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ধর্ম সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে রক্ষা করতে চায় এবং সব রকম পরিবর্তনের বিরোধীতা করে। যারা ধার্মিক তারা বিশ্বাস করে, ধর্মীয় মূল্যবোধ সমাজের প্রয়োজন অনুসারে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট হয় নি। এই মূল্যবোধ ঈশ্বর প্রদত্ত। ঈশ্বর সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ, নির্ভুল এবং মানুষের চেয়ে অনেক বড় ও উর্ধে। কাজেই ঈশ্বরের অনুশাসন নির্ভুল ও অপরিবর্তনীয় এবং সকল যুগে, সকল কালে এবং সকল সমাজে সমভাবে প্রযোজ্য। যদি অন্য কোনও মূল্যবোধ ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরোধী হয়, তবে সে মূল্যবোধকে রোধ করে ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কারণ এই মূল্যবোধ ঈশ্বর প্রদত্ত এবং তাই অভ্রান্ত ও মঙ্গলকর। সুতরাং কোন সামাজিক পবিবর্তন যদি ধর্মীয় অনুশাসন বিরোধী হয়, তবে সে পরিবর্তন অমঙ্গলকর, ভ্রান্ত এবং পরিত্যাজ্য।

এই রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য ধর্ম যুগে যুগে প্রতিক্রিয়াশীলতার অস্ত্র হিসাবে সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের সকল প্রচেষ্টার বিরোধীতা করেছে। মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় গির্জা সকল মুক্ত চিন্তার গলা টিপে মেরেছে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, এই সত্য নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেও গালিলিও তা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। মধ্যযুগে ধর্ম বিজ্ঞানের প্রগতিকে রুদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছে, বিদগ্ধজনের চিন্তাধারাকে নিস্তব্ধ করতে চেষ্টা করেছে, মানুষের গণতান্ত্রিক স্পৃহাকে থামিয়ে দিতে

চেয়েছে। ডারউইন ও হাক্সলীর মত সত্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানীদের নিপীড়িত হতে হয়েছে। বিভিন্ন দেশে এবং সমাজে ধর্ম সকল প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে বাধা দিয়েছে, মানুষের উপর মানুষের শোষণকে সমর্থন করেছে এবং গণতন্ত্রের বিকাশকে বাধা দিয়েছে।

কাজেই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্ম রক্ষণশীল এবং ধর্ম সমাজের পুরাতন মূল্যবোধকে আঁকড়িয়ে থেকে পরিবর্তনকে বাধা দেয়। তবে কেউ কেউ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনের হোতাও হতে পারে। সমাজ-বিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার দেখাতে চেয়েছেন যে, ধর্ম অবস্থা বিশেষে সমাজকে প্রভাবিত করে। তাঁর মতে প্রটেষ্টাণ্ট ক্যালভিনের পুরাতন রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা, ইউরোপে পুঁজিবাদের উন্মেষে সহায়তা করেছে এবং ক্যালভিনের খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে নতুন মতবাদ ইউরোপীয় সামন্ত সমাজে পুঁজিবাদী পরিবর্তনের প্রেরণা যুগিয়েছে। ওয়েবারের মত অনেকে গ্রহণ করেন নি। তাঁরা বলেছেন, ইউরোপে পুঁজিবাদের উন্মেষের কারণ, ধর্মীয় পরিবর্তন নয়, বরঞ্চ পুঁজিবাদের উন্মেষই ধর্মীয় পরিবর্তনের উৎস। বস্তুতঃ এপ্রসঙ্গে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

ওয়েবার সমাজে ধর্মপ্রবর্তকদের ভূমিকা আলোচনা করে সমাজের উপর তাদের প্রভাব দেখাতে চেয়েছেন। ধর্ম সাধারণতঃ ধর্মপ্রবর্তকের দ্বারা স্থাপিত ও প্রচারিত হয়। কেউ বলেন, ধর্ম প্রবর্তক একটি নতুন যুগের নির্দেশ দেন; কারো মতে, তিনি সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল।

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, ধর্ম প্রবর্তক হচ্ছেন একটা অদৃষ্টপূর্ব গুণে গুণান্বিত আকর্ষণীয় নেতৃত্বের ধর্মীয় প্রকাশ। ধর্ম প্রবর্তকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে; এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক করে তুলে ধরে এবং তাকে অতিপ্রাকৃত অতি-মানবিক বা অপূর্ব ক্ষমতা ও অদৃষ্টপূর্ব সদগুণের অধিকারী বলে চিহ্নিত করে। এই অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণী শক্তির জন্য ধর্ম প্রবর্তককে অনুসারীরা নির্বিবাদে গ্রহণ করে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আসক্তি প্রদর্শন করে। অর্থাৎ ধর্মপ্রবর্তক এই অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলেন।

ওয়েবার বলেন, ধর্মপ্রবর্তক সমাজে একটি নতুন শক্তি। তিনি নতুন দায়িত্ব ও কর্তব্য সৃষ্টি করেন, তা প্রচার করেন এবং অনুসারীদের মানতে বাধ্য করেন। ধর্ম প্রবর্তক অতীতকে মুছে ফেলেন এবং এই অর্থে তিনি একটি বৈপ্লবিক শক্তি। তিনি সংঘাত, দুঃখ-দুর্দশা, বেদনা, হতাশা এবং কর্মপ্রেরণার নতুন অর্থ ও ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অর্থ সম্পর্কে নতুন ধারণা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করেন। এক কথায়, ধর্ম প্রবর্তক সমাজে বিপ্লব আনেন এবং ধর্মই সমাজের পরিবর্তনের গতিপথ নির্দেশ করে।

ধর্মপ্রবর্তক যে সমাজে পরিবর্তন আনেন, তাতে সন্দেহ নেই। যীশু, মোহাম্মদ, বুদ্ধ, সকল ধর্মপ্রবর্তকই সমাজে পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। ইতিহাসকে মানতে হলে, সমাজের উপর ধর্মপ্রবর্তকের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না।

কিন্তু যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দরুন ধর্মপ্রবর্তক যুগ পরিবর্তনের অগ্রনায়ক হিসাবে সাফল্য লাভ করেন, সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর গঠন ও বিকাশের পেছনে সমাজের কি কোনও দান নেই? সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশ কি ধর্মপ্রবর্তকের চরিত্র গঠনে এবং বিকাশে সহায়তা করে না? ধর্ম প্রবর্তক কি সামাজিক অবস্থা ও ঘাত-প্রতিঘাতের ফল নন?

এইসব প্রশ্নের জবাবে একটিই ধর্ম প্রবর্তক নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি। তিনি সমাজের সমকালীন অবস্থার উর্ধে নন এবং সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্ত নন। তবে একবার ধর্ম প্রবর্তক সমাজে আবির্ভূত হলে তিনি সামাজিক জীবনে নিজ পদচিহ্ন এঁকে দেন।

ধর্মপ্রবর্তক যে বিপ্লব ঘটান, তার স্থায়ীত্ব কি? ওয়েবার বলেন, ধর্ম প্রবর্তকের প্রভাব সবচেয়ে বেশী থাকে বিপ্লবের শুরুতে এবং যতই দিন যায়, ততই তার প্রভাব কমে আসে। প্রথম অবস্থায় ধর্ম প্রবর্তক অনুসারীদের মধ্যে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন, কালক্রমে তা স্তিমিত হয়ে আসে এবং অনুসারীদের বিভিন্ন স্বার্থ এবং চাহিদা প্রবল

হয়ে দেখা দেয়। অনুসারীরা ক্রমশঃ নিজেদের স্বার্থ ও চাহিদা অনুযায়ী ধর্মপ্রবর্তকের চিন্তাধারাকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখায়। এমন কি, ধর্মপ্রবর্তকের সকল শিক্ষা গৃহীত হয় না; যে সব শিক্ষা অনুসারীদের স্বার্থ ও চাহিদা পূরণে সহায়ক, সেগুলোকে বেছে নেওয়া হয় এবং যে সকল শিক্ষা তাদের স্বার্থ ও চাহিদা পূরণে সহায়ক নয়, সেগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মোট কথা, ধর্মপ্রবর্তকের শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে উদ্দীপনার সঙ্গে গৃহীত হয়, কিন্তু কালক্রমে অনুসারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থ ও চাহিদা ধর্মপ্রবর্তকের চিন্তাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং অনুসারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিবেশ ধর্মপ্রবর্তকের শিক্ষার সঙ্গে পরিমিশ্রিত হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে সামাজিক পরিবর্তনে ধর্মপ্রবর্তকের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া চলে না। শুধু এইটুকু বলা চলে যে, ধর্মপ্রবর্তক একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেন। কিন্তু তিনি সমসাময়িক সামাজি. পরিবেশের উর্ধ্বে নন এবং তাঁর চিন্তাধারা ও শিক্ষা কালক্রমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বাইবেলে বর্ণিত যীশুখ্রীস্টের সকল শিক্ষা সমকালীন ইহুদী সমাজ গ্রহণ করেনি, যে সকল শিক্ষা ইহুদী সমাজের সংস্কৃতির বিরোধী ছিল, সেগুলোকে পরিহার করা হয়েছিল। যীশুখ্রীস্টের ভক্ত শিষ্যরাও তাঁর সকল শিক্ষা গ্রহণ করেনি; তাদের সমসাময়িক সমাজের ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর খুব একটা বিরোধী নয় এমন শিক্ষাই শুধু তারা গ্রহণ করে। খ্রীস্টান-ধর্ম-প্রচারকগণ যখন খ্রীস্টের ধর্মমত রোমান সাম্রাজ্যে নিয়ে গেল, তখন তারা একটা সম্পূর্ণ আলাদা সমাজ-ব্যবস্থার সাক্ষাৎ পেলো। রোমান সমাজের সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ও আদর্শের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, যীশুখ্রীস্টের এমন শিক্ষাগুলোই রোমানরা গ্রহণ করলো। ব্যাপটিস্ম, লর্ডস সাপার প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। যীশুখ্রীস্টের জীবদ্দশায় তাঁর সহচরদের নিয়ে একটা সরল, অনাড়ম্বর এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। রোমান রাজতন্ত্রের প্রভাবে এই সংগঠন একটা পুরোহিততন্ত্রে পরিণত হয়ে পড়লো।

অষ্টম অধ্যায়

পুঁজিবাদ ও ধর্ম

পুঁজিবাদের জন্ম ইউরোপে। মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রথার সমাধি রচনা করে ষোড়শ শতাব্দীতে আধুনিক পুঁজিবাদের জন্ম হয়। জমির মালিক সামন্ত প্রভুদের স্থলাভিষিক্ত হয় পুঁজির মালিক বুর্জোয়া শ্রেণী।

সমাজ-বিজ্ঞানী ওয়েবার বলেন, পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভবের পেছনে কাজ করেছে পুঁজিবাদী প্রেরণা এবং পুঁজিবাদী প্রেরণার বিকাশের পেছনে রয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে পোপের আধিপত্যের বিরুদ্ধে খ্রীস্টীয় ধর্মবিপ্লব অর্থাৎ রিফরমেশন।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বলতে ওয়েবার বুঝেছেন, অবাধ শ্রমের যুক্তিসিদ্ধ সংগঠনের মাধ্যমে লাভের সকল সুযোগের শান্তিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ ব্যবসায়িক লেন দেনের ফলে মুনাফা অর্জিত হয়। বছরের শেষে সকল লেন-দেন ও পণ্য বিনিময়ের হিসাব-নিকাশ করা হয় এবং লাভ-ক্ষতির খতিয়ান নেওয়া হয়। বছরের শুরুতে যে পুঁজি নিয়ে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়, বছরের শেষে যদি সে পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে বুঝতে হবে সম্পদ বেড়েছে এবং মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

তবে ওয়েবার বলেন, মুনাফার বাসনা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একচেটিয়া নয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মাত্রেই মুনাফার বাসনা কাজ করে। সব আর্থিক ব্যবস্থাতেই লাভ ক্ষতির হিসাব করা হয়। কিন্তু হিসাব-নিকাশের যুক্তিসিদ্ধ ব্যবহার শুরু হয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়। বস্তুতঃ সুষ্ঠু বাণিজ্যিক হিসাব-নিকাশ পুঁজিবাদের অন্যতম লক্ষণ।

লাভের আশা পুঁজিবাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য নয়, পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্য অবাধ শ্রমের যুক্তিসিদ্ধ ব্যবহার। পূর্ববর্তী অন্য

কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অবাধ শ্রমের যুক্তিসম্মত ব্যবহার নেই। সামন্ত প্রথায় অবাধ শ্রমের অস্তিত্ব ছিল না. শ্রম ছিল বাধ্যকরী। সকল শ্রমিক ছিল সামন্ত প্রভুর অধীনস্থ প্রজা।

সামন্ত অর্থনীতি প্রধানতঃ গার্হস্থ্য অর্থনীতি। সামন্ত প্রভুর গৃহে তার অধীনস্থ সকল প্রজাকে কাজ করতে হয়। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ গৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ব্যবসায়িক সংস্থাগুলো গৃহে সীমাবদ্ধ নয়, কল-কারখানাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌথ উদ্যম।

বস্তুতঃ অবাধশ্রম কথাটা শুধু পুঁজিবাদী সমাজেই প্রযোজ্য। একমাত্র পুঁজিবাদী সমাজেই শ্রেণী হিসাবে শ্রমের অস্তিত্ব আছে। অধমর্ণ ও উত্তমর্ণের মধ্যে, জমিদার ও ভূমিহীনের মধ্যে, বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে সংঘাত যে কোনও অর্থনীতিতেই থাকতে পারে; কিন্তু বৃহৎ শিল্পের মালিক পুঁজিপতি এবং মজুরীর বিনিময়ে শ্রম বিক্রেতা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ একমাত্র পুঁজিবাদী সমাজেই দেখা যায়। শ্রেণী সংগ্রাম কথাটা পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি।

ওয়েবার তাই বলেন, পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য মুনাফার বাসনায় পুঁজির যুক্তিসঙ্গত বিনিয়োগ এবং অবাধ শ্রমের যুক্তিসিদ্ধ সংগঠন।

পুঁজিবাদের উন্মেষের পেছনে যে প্রেরণা, তাকে ঠিক এক কথায় ব্যাখ্যা করা চলে না। ওয়েবার এই পুঁজিবাদী প্রেরণা বোঝাতে বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"মনে রেখ, সময়ই অর্থ। তুমি এক দিনের শ্রমের বিনিময়ে দশ শিলিং পেতে পারো। কিন্তু যদি তুমি অর্ধেক দিন কাজ করে বাকী অর্ধেক দিন বসে কাটাও এবং সারাদিনে ছয় পেনী খরচ করো, তা হলে তোমার খরচ কেবলমাত্র ছয় পেনী নয়, প্রকৃতপক্ষে তুমি আরও পাঁচ শিলিং খরচ করে ফেলেছো কিংবা হারিয়েছো।"

"মনে রেখ, অর্থ সৃজনশীল। টাকাই টাকা আনে এবং আরো অর্থ আরো অর্থ আনে। পাঁচ শিলিং বিনিয়োগ করলে ছয় শিলিং-এ দাঁড়ায়, ছয় শিলিং আবার বিনিয়োগ করলে সাত শিলিং তিন

পেনী হয় এবং এভাবে ক্রমাগত বিনিয়োগে পাঁচ শিলিং কালক্রমে একশ' পাউণ্ডে দাঁড়ায়। যে একটা ক্রাউন অপব্যয় করে, সে শুধু ঐ ক্রাউনটাই হারায় না, বরং ক্রাউনটা যে অসংখ্য পাউণ্ড উৎপাদন করতে পারতো, তাও সে হারায়।"

"মনে রেখ, যে সময়মত ঋণ পরিশোধ করে, সবাই তাকে ঋণ দিতে চায়। যথাসময়ে এবং প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ঋণ পরিশোধ করার জন্য যার সুনাম আছে সে যে-কোনও মুহূর্তে এবং যে-কোনও কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ ধার পায়। বস্তুতঃ পরিশ্রম এবং মিত-ব্যয়িতার পরে লেন-দেনে নিয়মনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতাই সেই সদগুণ, যা একটি যুবককে আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করে। কাজেই প্রতিশ্রুত সময়ের একদিনও বেশী ঋণের টাকা ধরে রাখবে না; রাখলে, তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আর ঋণ পাবে না।"

"অর্থনৈতিক ব্যাপারে তোমার প্রতি যাতে আস্থা থাকে, সে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। যদি উত্তমর্ণ তোমার কর্মস্থলে সকাল পাঁচটায় ও রাত আটটায় হাতুড়ির আওয়াজ পায়, তবে সে টাকা পাওনা হলেও ফেরৎ চাইবে না; কিন্তু সে যদি তোমাকে কাজের সময় ক্লাবে দেখে কিংবা হোটেলে আমোদে ব্যস্ত দেখতে পায়, তা'হলে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই সে তার টাকা দাবী করে বসবে।"

"তোমাকে কার্যরত দেখলে উত্তমর্ণ মনে করে, তুমি তোমার ঋণ সম্পর্কে সজাগ এবং তুমি সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ। ফলে তোমার প্রতি আস্থা বাড়ে।"

"যে সময়টুকু কাজ করে পাঁচ শিলিং আয় করা যায়, সে সময় যে বসে কাটায়, সে প্রকৃতপক্ষে পাঁচ শিলিং হারায়। এই ক্ষতি পাঁচ শিলিং পানিতে ফেলে দেওয়ার শামিল।"

"যে পাঁচ শিলিং হারায়, তার শুধু পাঁচ শিলিং ক্ষতি হয় না, এই অর্থ খাটিয়ে যে লাভ হতো তা-ও সে হারায়। এই লাভের অর্থ বার বার বিনিয়োগ করলে বৃদ্ধ বয়সে অনেক টাকায় গিয়ে দাঁড়াতে পারতো"।

এখানে বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন যে অর্থ-লালসার পরিচয় দিয়েছেন, সে জন্য তিনি বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব করেননি। বরঞ্চ তিনি অর্থের লালসাকে একজন সৎ ব্যবসায়ীর আদর্শরূপে তুলে ধরেছেন। নিজ নিজ পুঁজির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকে তিনি ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য বলে চিহ্নিত করেছেন। এই যে পুঁজিবাদী প্রেরণা তা, ব্যবসায়িক চাতুর্য নয়; একটা সার্বজনীন আদর্শ।

ফ্র্যাংকলিনের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সাধুতা মূল্যবান; কারণ সাধুতা ছাড়া মুনাফা বাড়ানো চলে না; পুঁজির বিনিয়োগে ব্যবসায়িক আস্থা অত্যাবশ্যক। সময়ানুবর্তিতা, পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলীও একই কারণে মূল্যবান। মোটকথা, সাধুতা, সময়ানুবর্তিতা, পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি নৈতিক আদর্শ পুঁজিবাদী প্রেরণা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। কারণ এই সকল নৈতিক আদর্শ ব্যতিরেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যুক্তিসিদ্ধ মুনাফা অর্জন সম্ভবপর নয়।

পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন যদি পেশা হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তা'হলে নৈতিক আদর্শগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। পেশাকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য জ্ঞান করে দক্ষতা ও সততার সঙ্গে নিজ নিজ পেশার অনুশীলন করতে হবে। পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনই যার পেশা, তার জন্য একাগ্রতার সঙ্গে এবং নৈতিক আদর্শের কথা মনে রেখে নিজ পেশায় লিপ্ত থাকাই একান্ত কর্তব্য। পেশার প্রতি নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ এবং পেশার সেবায় একাগ্রতাই বস্তুতঃ পুঁজিবাদের বিকাশে প্রেরণা যুগিয়েছে।

শুধু পুঁজির মালিক নয়, শ্রমের বিনিময়ে লাভ-প্রত্যাশী শ্রমিকও এই একই কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। শ্রমিক যদি তার পেশার প্রতি নিষ্ঠাবান ও একাগ্রচিত্ত না হয়, তাহলে তার কাছ থেকে কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। মজুরী চার টাকা থেকে বাড়িয়ে আট টাকা করলে, যদি সে অর্ধেক দিক কাজ করে চার টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তা'হলে শ্রমের যুক্তিসিদ্ধ ব্যবহার সম্ভব নয়। অপর পক্ষে, তার মজুরী কমিয়ে দিলে সে বেশীক্ষণ কাজ করবে হয়ত, কিন্তু

তাতে উৎপাদন বাড়বে না ; সে কাজে ফাঁকি দেবে। কম পরিশ্রম করে এবং বেশী আরামে থেকে কি করে ন্যূন প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যায়, সেটা যদি শ্রমিকের মনোবৃত্তি হয়, তাহলে শ্রমের মান উন্নত হতে পারে না এবং শ্রমের যুক্তিসিদ্ধ সংগঠন সম্ভব নয়। কারণ শ্রমিক তার পেশার প্রতি নিষ্ঠাবান নয়। সে যদি তার পেশাকে অবশ্য পালনীয় মনে করতো তা'হলে সে সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যথাসাধ্য মজুরী লাভে প্রয়াসী হতো।

মোটকথা, পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় লাভের প্রত্যাশা পেশার প্রতি কর্তব্যবোধে রূপান্তরিত হয়েছে এবং একটা নৈতিক আদর্শরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

পেশার প্রতি নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ এবং অর্থের বাসনাকে সততা, মিতব্যয়িতা, শ্রমশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি নৈতিক আদর্শ হিসাবে পরিগণনা—এই পুঁজিবাদী প্রেরণার বিকাশ ঘটলো কি করে? লাভের লালসা আগেও ছিল। তবে সে লালসা চরিতার্থ হতো অসৎ পন্থায়। অর্থ অর্জনের পেশা তখন নৈতিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং অর্থের লালসার পেছনে কোনও যুক্তিসিদ্ধ নৈতিক আদর্শ ছিল না। অর্থের লালসা এবং তা' চরিতার্থ করার পেশা ছিল হীনমন্যতা এবং খ্রীস্টধর্ম তাকে কঠোর হস্তে দমন করেছে।

ওয়েবার বলেন, পুঁজিবাদী প্রেরণার সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে ইউরোপীয় ধর্মবিপ্লব বা রিফরমেশন। এই বিপ্লবের অগ্রদূত ছিলেন মার্টি'ন লুথার এবং পরে ক্যালভিন এই বিপ্লবকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান।

মার্টি'ন লুথার পেশার বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দেন। বাইবেলের অনুবাদে লুথার পেশা শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা' পুঁজিবাদী প্রেরণায় পেশার ধারণার প্রায় অনুরূপ। পার্থিব জীবনে নিজ নিজ কর্তব্যের সুষ্ঠু সম্পাদনকেই লুথার সর্বোচ্চ নৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে চিহ্নিত করেছেন। ফলে পার্থিব পেশার অনুশীলন ধর্মীয় গুরুত্ব লাভ করেছে। ঈশ্বরের মনঃপূত জীবন যাপনের উপায় কঠোর

তপশ্চর্যা নয়। সংসারে ব্যক্তি যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার করণীয় কার্যের সুষ্ঠু সম্পাদন অর্থাৎ তার পেশার পূর্ণ অনুশীলনই ঈশ্বরের মনঃপূত জীবন যাপনের একমাত্র উপায়। ন্যায্য কর্তব্য হিসাবে, তপস্যার জীবন ঈশ্বরের কাছে অর্থহীন। বরঞ্চ পার্থিব কর্তব্য অবহেলা স্বার্থপরতার নামান্তর এবং সংসারের দায়িত্ব পরিত্যাগ ছাড়া আর কিছু নয়। পার্থিব কর্তব্য সম্পাদনই ঈশ্বরের মনঃপূত জীবন যাপনের একমাত্র উপায় এবং এই কর্তব্য সম্পাদনই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। কাজেই সকল পেশাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমতুল্য।

একথা বলাই বাহুল্য যে, পেশার এই নতুন ব্যাখ্যা পুঁজিবাদী প্রেরণাকে উদ্দীপিত করবে। অর্থোপার্জনের পেশা অবলম্বন করা নিন্দনীয় নয়। সততা, মিতব্যয়িতা, শ্রমশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ সামনে রেখে যদি কেউ অর্থ লাভের আশায় নিজ নিজ পেশায় লিপ্ত হন, তা'হলে বস্তুতঃ সে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করছে।

মার্টিন লুথার পার্থিব কর্মের উপর জোর দিলেও তিনি রক্ষণশীলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর মতবাদ ছিল রক্ষণশীল। তিনি তাই পুঁজিবাদী কার্যকলাপ অনুমোদন করতে পারেননি এবং উঠতি সামাজিক শ্রেণীগুলিকে সুনজরে দেখেননি। ফলে পার্থিব পেশা সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা সম্ভাবনাময় হলেও কার্যক্ষেত্রে পুঁজিবাদী প্রেরণার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক হয়নি।

মার্টিন লুথারের আরব্ধ কাজকে সফল বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ক্যালভিন। নিয়তি ও পরিত্রাণ সম্পর্কে ক্যালভিনের মতবাদ পার্থিব পেশার উপর যে জোর দিয়েছে, তা পুঁজিবাদী প্রেরণার পরিপূর্ণ বিকাশকে সুনিশ্চিত করেছে।

ক্যালভিনের মতে মানুষের নিয়তি ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব-নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কে পরিত্রাণ পাবে, আর কার জন্য অনন্ত নরক ভোগ, তা ঈশ্বর পূর্বেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন—ব্যক্তির কোন হাত রাখেননি

পার্থিব কোনও প্রচেষ্টাতেই নিয়তিকে বদলানো যায় না, কোনও আচার অনুষ্ঠান; কোনও বিধান পালনই ব্যক্তিকে কোনও সহায়তা দেবে না। ঈশ্বর কাকে পরিত্রাণ লাভের জন্য মনোনীত করেছেন, অর্থাৎ কে ঈশ্বরের প্রিয়, তা জানবার উপায় কি? ঈশ্বরের মনোনয়নের প্রমাণ কি? যে পার্থিব জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেই কি ঈশ্বরের প্রিয়? পার্থিব প্রতিষ্ঠাই কি ঈশ্বরের মনোনয়ন লাভের প্রমাণ নয়? ব্যক্তির পক্ষে একথা ভাবাই স্বাভাবিক যে, ঈশ্বর যাকে পরিত্রাণের জন্য মনোনীত করেছেন, সে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। অর্থাৎ নিজ নিজ পেশার অনুশীলন করে যে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রিয়। ব্যক্তি তাই পার্থিব পেশার কঠোর অনুশীলন করে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করবে তাতে আর বিচিত্র কি! অর্থ অর্জনই যার পেশা, সে স্বভাবতঃই কায়মনবাক্যে তার পেশায় ব্যাপৃত হয়ে সাফল্য লাভের চেষ্টা করবে। কারণ পার্থিব প্রতিষ্ঠাই ঈশ্বরের মনোনয়নের একমাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ। ক্যালভিন বলেন, কেবলমাত্র ঈশ্বরই করুণা করতে পারেন এবং তার করুণা পেতে হলে মানুষকে তার মহিমা ঘোষণা করতে হবে। বস্তুতঃ বিশ্ব-সংসার ও মানবজীবনের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা। ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করতে হলে সৎজীবন যাপন করতে হবে এবং ঈশ্বরের নির্দিষ্ট পথে চলতে হবে। সেজন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। পার্থিব কর্ম করতে হবে, কিন্তু সততা, মিতব্যয়িতা, মিতাচার, শ্রমশীলতা, সময়ানুবর্তিতা প্রভৃতি সদাচারের আদর্শ সামনে রেখে কাজ করতে হবে। কারণ কর্মের মাধ্যমেই ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করা সম্ভব, অন্য উপায়ে নয়। অর্থ উপার্জন যদি পেশা হয়, তবে নিষ্ঠার সঙ্গে এবং কর্তব্যবোধের আদর্শ নিয়ে নিজ নিজ কর্মে লিপ্ত হতে হবে। নিছক বসে থেকে আলস্যে কাল হরণ করে কিংবা তপস্যায় মগ্ন হয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করা সম্ভব নয়। সৎপথে এবং সততার সঙ্গে নিজ পেশা প্রতিপালনের মাধ্যমেই ব্যক্তি ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করতে পারে।

একদিকে ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের জন্য ব্যক্তিকে সংজীবন যাপন করতে হবে; অপরদিকে ঈশ্বরের মনোনয়ন প্রমাণের জন্য নিজ নিজ পেশার সুষ্ঠু অনুশীলন করতে হবে। ব্যক্তির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সে পরিত্রাণ পাবে কিনা, তা সে জানে না। নিজের পরিত্রাণ নিশ্চিত করবার কোনও ক্ষমতা ব্যক্তির নেই। মৃত্যুর পরবর্তী ললাট লিখন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এবং পরিত্রাণ সম্পর্কে ক্ষমতাহীনতা ব্যক্তির জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে বাধ্য। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে ব্যক্তি কিছুটা আশ্বাস, কিছুটা নিশ্চয়তা, কিছুটা নিরাপত্তা চায়। এবং সংকর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি এই আত্মবিশ্বাস লাভ করতে সচেষ্ট হয়। অনিরাপত্তার হাত থেকে রক্ষার জন্য কিছু একটা করা দরকার এবং ব্যক্তির যে পেশা, তার সুষ্ঠু অনুশীলন ছাড়া সে আর কি করতে পারে। কাজেই ব্যক্তি সৎপথে থেকে নিজ পেশাকে কর্তব্য মনে করে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস পেতে চায়। নিজ নিজ পেশার অনুশীলন হয়ত তাকে পরিত্রাণ দেবে না, কিন্তু নরক-যন্ত্রণার ভীতির হাত থেকে রক্ষা করবে।

পার্থিব কর্মের যে ধর্মীয় মূল্য ও গুরুত্ব ক্যালভিন তুলে ধরেছেন, তা স্বভাবতঃই পুঁজিবাদী প্রেরণাকে উদ্দীপ্ত করেছে। পরকাল অনন্ত বিশ্রামের সময়; ইহকাল কর্মের সময়। আলস্য ও সম্ভোগ নয়, একমাত্র নিরলস কর্মই ঈশ্বরের মহিমাকে সমৃদ্ধ করে। বৃথা কালক্ষেপ তাই মহাপাপ। জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং ঈশ্বরের মনোনয়ন লাভের জন্য কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের সময় সংকীর্ণ। কাজেই আলস্যে কালহরণ না করে এবং তপশ্চর্যায় মগ্ন না হয়ে নিজ পেশায় ব্যাপৃত থেকে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করা ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।

ঈশ্বর যদি কারও সামনে লাভের সম্ভাবনা তুলে ধরেন, তবে তাকে লাভের উদ্দেশ্যে কাজে নিয়োজিত হতে হবে। ঈশ্বর যদি ব্যক্তিকে অর্থ অর্জনের সুযোগ দেন, তবে সে সুযোগ অগ্রাহ্য করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় অমান্য করার নামান্তর। কাজেই ঈশ্বর যদি চান যে, তুমি অর্থ অর্জনকে পেশারূপে গ্রহণ করো, তবে তোমাকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত

সেই পেশাই গ্রহণ করতে হবে। সম্পদ আহরণ দোষের নয়; যদি তুমি তোমার পেশাকে কর্তব্য মনে করে এবং নৈতিক আদর্শ মনে রেখে অর্থ অর্জনের পেশার অনুশীলন করো, তবে তুমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করছো এবং তোমার কোনও অন্যায় নেই। অর্থ অর্জনের স্পৃহা তখনই নিন্দনীয়, যখন তুমি অলস ও পাপপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য অর্থ প্রত্যাশা কর। তবে সৎপথে এবং সৎপেশায় অর্থ অর্জন ঈশ্বরের অভিপ্রেত। বরঞ্চ যে গরীব থাকতে চায়, সে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তার দারিদ্র্য ঈশ্বরের মহিমার পরিপন্থী। যে কাজ করতে পারে, কিন্তু ভিক্ষার অন্নে জীবিকা নির্বাহ করতে চায়, সে অলসতা পাপে পাপী। ফলতঃ পুঁজিবাদী কার্যকলাপের দ্বারা অর্থ অর্জনই হচ্ছে ঈশ্বরের মন পূত উপায়ে জীবন যাপন।

ওয়েবার অবশ্য অস্বীকার করেননি যে, পুঁজিবাদের বিকাশে তৎকালীন সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তবে তাঁর মতে, অন্যান্য কারণের মত ধর্ম-বিপ্লবও পুঁজিবাদের বিকাশের একটি কারণ। ধর্ম-বিপ্লবের যে ভূমিকা, তা' প্রধানতঃ পুঁজিবাদী প্রেরণার বিকাশে সক্রিয় সহায়তা। অর্থাৎ ক্যালভিনের বিপ্লবাত্মক মতবাদ পুঁজিবাদী প্রেরণার উন্মেষে সহায়তা করেছে। ক্যালভিনের মতবাদই পুঁজিবাদী প্রেরণার উন্মেষের একমাত্র কারণ নয়, কিংবা পুঁজিবাদ ধর্মীয় বিপ্লবের সৃষ্টি নয়।

পুঁজিবাদের বিকাশে ধর্মবিপ্লবের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। তবে এ ভূমিকার রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। ওয়েবার ক্যালভিনের প্রভাব যতটা মনে করেছেন, প্রকৃতপক্ষে ততটা নাও হতে পারে। ওয়েবার বলেন, ক্যালভিনের পরিত্রাণ ও নিয়তি সম্পর্কে মতবাদ পার্থিব পেশার কঠোর অনুশীলনের পক্ষে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়েছে। কিন্তু ক্যালভিনের মতবাদের ফল বিপরীতও হতে পারতো। নিজের ভাগ্য যদি পূর্ব-নির্দিষ্ট হয় এবং কোন ক্রমেই যদি ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব না হয়, তাহলে কর্ম করা বা না করার পরিণাম একই। কর্ম করেও যা, কর্ম না করেও যদি তাই হয়, তাহলে

কর্ম করে লাভ কি! নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাই কি শ্রেয় নয়; পার্থিব জগৎ সম্পর্কে উদাসীনতাই কি শ্রেয় নয়? কাজেই ক্যালভিনের নিয়তিবাদ বৈরাগ্যের পথ নির্দেশ করছে। তবে তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজ যে বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ না করে কঠোর কর্মের পথ গ্রহণ করেছে, তার কারণ কি? তার কারণ নিশ্চয়ই তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি। তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি নিশ্চয়ই কঠোর কর্মময় জীবনের অনুকূল ছিল। অর্থাৎ সমকালীন ইউরোপে তখন পুঁজিবাদী প্রেরণা ইতিমধ্যেই বিস্তার লাভ করেছে এবং এই পরিস্থিতিতে ক্যালভিনের মতবাদ পুঁজিবাদী প্রেরণার অনুকূল ছিল বলে সমাজ এই মতবাদকে আঁকড়ে ধরেছে। অপরপক্ষে এ কথাও বলা চলে যে, ক্যালভিনের মতবাদকে পুঁজিবাদী প্রেরণা প্রভাবিত করেছে। ক্যালভিন লক্ষ্য করেছেন, সমাজ কি চায় এবং সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি এমন মতবাদ সৃষ্টি করেছেন যা পুঁজিবাদী সমাজকে ধর্মীয় সমর্থন দেবে।

বস্তুতঃ বলা চলে যে, পুঁজিবাদী ও ধর্মবিপ্লব পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। নতুন পুঁজিবাদী সমাজের উত্থানের ফলে এবং নতুন সৃষ্ট শ্রেণীগুলোর প্রয়োজনে ধর্মীয় আদর্শ ও মতবাদ পরিবর্তিত হয়েছে। আবার ধর্মনেতাগণ ধর্মীয় ব্যাখ্যার দ্বারা নতুন সমাজের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন এবং নতুন সমাজ যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

নবম অধ্যায়

রাষ্ট্র ও ধর্ম

সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে রাষ্ট্র অন্যতম। কাজেই ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচনা করলে সমাজ ও ধর্মের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

প্রচীনকালে রাষ্ট্র আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল। অধিকাংশ রাষ্ট্রই ছিল উপজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রগুলোকে বলা হয় নগর-রাষ্ট্র। কারণ একেকটি নগর নিয়ে একেকটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল।

রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় একেকটি ছোট রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ছিল এক ধর্মে বিশ্বাসী। "এক রাষ্ট্র একধর্ম", প্রাচীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম বিশেষত্ব। ফলে রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধে কোনও প্রভেদ ছিল না। তাছাড়া আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, গোষ্ঠীর সাধারণ কল্যাণের জন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিধান ও অনুশাসন প্রতিপালন আবশ্যক। স্বাভাবতঃই রাষ্ট্রকে এ সকল বিধান ও অনুশাসন মেনে চলতে হতো এবং ধর্মনীতিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ সম্ভবপর ছিল না।

রাষ্ট্র ও ধর্মের এই অভিন্নতার চরম প্রকাশ ঘটেছিল রাষ্ট্রনায়ক ও ধর্মনায়কের অভিন্নতায়। আদিম রাষ্ট্রে যে রাজা, সেই প্রধান পুরোহিত। পুরোহিত-রাজা, ঈশ্বর ও রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থ। সে রাজকার্য চালায়, আবার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে। রাজা একাধারে ধর্মীয়প্রধান, আবার রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও বিচারিক প্রধান। কোথাও রাষ্ট্রপ্রধান নাগরিকদের সাধারণ পিতৃস্বরূপ, কোথাও ঈশ্বরের অবতার, আবার কোথাও ঈশ্বরের বংশধর এবং উত্তরাধিকার। তাকে ঘিরে নানা বিধি-নিষেধ বা ট্যাবু। যেখানে ধর্মনায়কই রাষ্ট্রনায়ক, সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনও প্রভেদ নেই। কারণ ধর্মগুরু

হিসাবে যে ধর্মীয় বিধান দেয়, রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সেই ধর্মীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করে। ফলে রাষ্ট্রের সকল আইন কানুন মূলতঃ ধর্মীয় বিধান, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবহার শাস্ত্রের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের কোনও গরমিল খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রীক নগর রাষ্ট্রে যে আইন লংঘন করে, সে শুধু রাষ্ট্রীয় আইনে অপরাধী নয়; ধর্মীয় আইনেও সে পাপাচারে লিপ্ত।

একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন পরিবেশে ধর্ম রাষ্ট্রের সংহতির সহায়ক। বস্তুতঃ আদিম রাষ্ট্রে ধর্ম রাষ্ট্রীয় সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেখানে ধর্মই রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রনায়কই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে, সেখানে ধর্মে বিশ্বাসী নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রের অবাধ্যতা করার প্রশ্নই উঠে না। বরঞ্চ ধর্মীয় বিধান ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য তাদের রাষ্ট্রের প্রতি একাত্মবোধ ও আনুগত্যকে জোরদার করে।

তবে ধর্মীয় ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চিরকাল একটি ব্যক্তি বা একটি শ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকেনি। রাষ্ট্রের আয়তন বেড়েছে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জটিলতা দেখা দিয়েছে। একই ব্যক্তির পক্ষে ধর্মকাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজ চলিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রনায়ককে উত্তরোত্তর অধিক সময় রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যয় করতে হয়েছে এবং আবশ্যক ধর্ম-কর্ম সম্পাদনের ভার দিতে হয়েছে প্রতিনিধিদের উপর। শুরুতে একান্ত বশংবদ লোকদেরই প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং তারা শুধু নির্দিষ্ট ও সাময়িক কাজগুলোই নির্বাহ করতো। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে, রাষ্ট্রনায়ককে ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষমতা প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছে এবং তাঁর ধর্মনায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ না হলেও কালক্রমে একটা পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় ব্যাপারে এই পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে কোনও কোনও রাষ্ট্রে একটা দ্বৈত ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রনায়ক ঈশ্বরের অবতার, প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকার হিসাবে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রশাসন করে চলেছে বটে, কিন্তু ধর্মকার্য সম্পাদন করছে অন্য একটি পুরোহিত

শ্রেণী। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিম আফ্রিকার ইয়োরোবা রাষ্ট্রের কথা বলা যেতে পারে। এখানে রাজা ঈশ্বরের অবতার এবং রাজধানীতে বসে তিনি রাষ্ট্রশাসন করেন। ওদিকে প্রধান পুরোহিত ধর্মগুরু হিসাবে তাঁর নিজস্ব রাজধানীতে বসে ধর্মীয় আধিপত্য খাটান।

কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রনায়ক ও ধর্মনায়ক পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং উভয়েই ঐশ্বরিক বিধান থেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা দাবী করেন, সেখানে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। নানা কারণে সংঘর্ষ বাধতে পারে। সম্পত্তি, পদমর্যাদা, অধিকার-ক্ষেত্র, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যাখ্যা, এমনকি পরস্পরের প্রতি আস্থার অভাব থেকেও বিরোধের সূত্রপাত হতে পারে। তাছাড়া যেখানে ধর্মনায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতা ও আধিপত্য দাবী করে, সেখানে 'কে বড়' এ প্রশ্ন ওঠা একান্ত স্বাভাবিক। প্রাচীন ইহুদী রাষ্ট্রে, প্রাচীন মিশরে ও বাই-জানটিয়ামে এই বিরোধ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে ধর্মগুরু পোপের ক্ষমতার লড়াই চরমে উঠেছিল এবং সমগ্র ইউরোপের রাষ্ট্রীয় কল্যাণকে ব্যাহত করেছিল। এই পরিস্থিতিতে ধর্ম রাষ্ট্রীয় সংহতির সহায়ক না হয়ে বরং রাষ্ট্রীয় উন্নতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

যেখানে ধর্ম রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে, সেখানে ধর্ম রাষ্ট্রীয় সংহতির সহায়ক না হয়ে রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতার অপব্যবহারের সহায়ক হতে পারে। রাষ্ট্রনায়ক যদি বুঝতে পারে যে, ধর্মকে রাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসাবে জাহির করলে ধর্ম-বিশ্বাসী নাগরিক রাষ্ট্রের আধিপত্য মেনে নেবে এবং অবাধ্যতা করবে না, তাহলে সে স্বভাবতঃই ধর্মকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করে, নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। সে ধর্মীয় বিশ্বাস, অনুশাসন ও আচার পদ্ধতির এমন ব্যাখ্যা দেবে—যার ফলে নাগরিকেরা তার ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং প্রতিবাদ করতে সাহস না পায়। ধর্মের যে সব বিধান তার ক্ষমতার সহায়ক, সেগুলোর উপর সে জোর দেবে। আর যে সব বিধান তার ক্ষমতার পরিপন্থী, সেগুলোকে সে চেপে যাবে।

যদি রাষ্ট্রনায়ক ধর্মনায়ক হয়, তাহলে তার পক্ষে ধর্মকে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা খুবই সহজ। তবে ধর্মনায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক ভিন্ন হলে, উভয়েই ক্ষমতার লড়াইয়ে ধর্মকে নিজের কাজে ব্যবহার করবে। উভয়েই ধর্মকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করবে, যাতে তাদের নিজ নিজ আধিপত্য প্রমাণিত হয় এবং উভয়েই ধর্মের সহায়তায় ক্ষমতা হস্তগত ও সংরক্ষণের চেষ্টা করবে। ধর্ম আর একটা আদর্শ হিসাবে পরিগণিত না হয়ে ক্ষমতা-অধিকার ও সংরক্ষণের হাতিয়ারে পরিণত হবে। পাকিস্তান তার জলন্ত উদাহরণ। সেখানে ক্ষমতাসীন দল ধর্মকে নিজ ক্ষমতা সংরক্ষণ ও বিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে।

"এক ধর্ম, এক রাষ্ট্র" ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি। জগতে নতুন নতুন ধর্মের আবির্ভাবের ফলে এক রাষ্ট্রে একাধিক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে এক রাষ্ট্রে একাধিক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে এবং একাধিক ধর্মাবলম্বী আছে, সেখানে রাষ্ট্রের সামনে দু'টি পথ খোলা থাকে। রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মকে জড়িত করে না; ধর্ম নিজের ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচলনায় ও রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করে না। অথবা, রাষ্ট্র একটি ধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম রূপে চিহ্নিত করে এবং এই ধর্মই রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে। যে রাষ্ট্রে ধর্মই রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই শেষোক্ত পথটিই বেছে নেওয়া হয়। একটি ধর্মকে যদি রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে অপরাপর ধর্মের প্রতি একটা নীতি অবলম্বন করতেই হবে—হয় অন্যান্য ধর্মকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে, নতুবা অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা দেখাতে হবে। ধর্মীয় নির্যাতন রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা এবং সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হয়নি। কারণ কঠোর ও নির্দয় নির্যাতন ও দমননীতি চালিয়েও সংখ্যালঘু ধর্মগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব হয়নি। ফলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধ ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি এবং ধর্মীয় সংঘাত রাষ্ট্রের জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপে এই সংঘর্ষ চরমে উঠেছিল, কিন্তু ফলে ইউরোপের সার্বিক প্রগতি ব্যাহতই হয়েছে।

বস্তুতঃ একটি ধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে অন্য ধর্মকে নির্যাতন করার নীতির পেছনে রাষ্ট্রনায়কের প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস কাজ করে না; কাজ করে রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতার লালসা। একটি ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে এবং অন্য ধর্মকে দমন করে তিনি ঐ প্রধান ধর্মে বিশ্বাসী-দের সমর্থন লাভ করতে চেষ্টা করেন এবং 'ধর্ম বিপন্ন হলো' বা 'অন্য ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত' এমনি ধুয়া তুলে নিজের ক্ষমতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করতে প্রয়াস পান। যেখানে ধর্ম রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত, সেখানে বস্তুতঃ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও অপব্যবহারের হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্র-নায়ক যে রোমান ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিরুদ্ধ ধর্মকে দমন করতে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়েছেন, তা' প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল উদ্দেশ্যমূলক। নিজের শক্তি ও ক্ষমতাকে স্থায়ী ও নিরাপদ করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই ইউরোপীয় রাষ্ট্র-নায়করা ধর্মকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। পাকিস্তানও এক্ষেত্রে আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একথা বলাই বাহুল্য যে, এই ধরনের নীতি রাষ্ট্রীয় সংহতির পরিপন্থী এবং সকল উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একটি ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের নীতিও কার্যক্ষেত্রে ফলপ্রসূ নয়। কারণ, অন্যান্য ধর্মের কোনও অনুশাসন ও মতামত যদি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পরিপন্থী হয়, তাহলে রাষ্ট্র সেই মতকে দমন করতে বাধ্য। নতুবা প্রতিষ্ঠিত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে না। অপর পক্ষে, রাষ্ট্র পর-ধর্মে সহিষ্ণুতা দেখালেও অন্যান্য ধর্মের মানসিকতাকে পরিবর্তন করতে পারে না। কারণ অন্যান্য ধর্ম নিজেকে সংখ্যালঘু ভাবতে বাধ্য এবং ধর্মীয় পার্থক্য তাদের মধ্যে একটি শ্রেণী মনোভাবের সৃষ্টি করে এবং তারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় থেকে পৃথকভাবে নিজদের অস্তিত্ব চিন্তা ও অনুভব করে। ফলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে এবং রাষ্ট্রীয় ধর্ম অন্য ধর্মগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখে। প্রকাশ্যে রাষ্ট্র পর-ধর্ম সহিষ্ণুতার

কথা বললেও, বাস্তবে এই নীতি পুরোপুরি কার্যকরী করা সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সংহতি ও সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য।

রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মকে জড়িয়ে ফেলার পরিণাম রাষ্ট্রের সংহতি ও উন্নতির জন্য শুভ হয়নি। তাই এই পথ অনেক রাষ্ট্রকেই কালক্রমে পরিহার করতে হয়েছে। ধর্ম নিয়ে ইউরোপে এত মারামারি-কাটাকাটি হয়ে গেছে যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক করতে বাধ্য হয়েছে। তাই বর্তমান শতাব্দীতে সাধারণভাবে রাষ্ট্র প্রথমোক্ত পথই বেছে নিয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নাক গলায় না। ধর্ম নিজের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থেকে ধর্ম বিশ্বাসীদের নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। আর রাষ্ট্র সকল ধর্মীয় বিধান ও অনুশাসনের উর্ধ্বে থেকে ধর্মনিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রের সংহতি, শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও সার্বিক উন্নয়ন রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে; ধর্মের কোনও ভূমিকা নেই। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণের ফলে রাষ্ট্র ধর্মের প্রতি সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এবং সকল ধর্মকে সমদৃষ্টিতে দেখে। রাষ্ট্রের সাধারণ নীতির পরিপন্থী না হয়ে যে-কোনও ধর্ম নির্বিঘ্নে নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করতে পারে এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানের অবাধ স্বাধীনতায় রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না; কিংবা কোনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। অবাধে ধর্ম-কর্ম পালনের স্বাধীনতায় রাষ্ট্র যেমন বাধা দেয় না, তেমনি কোনও ধর্মের আচার-পদ্ধতিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয় না। আবার ধর্মীয় ভেদাভেদ যাতে রাষ্ট্রের সংহতি ও কল্যাণের পরিপন্থী না হয়, রাষ্ট্র সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখে।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্মীয় ভেদাভেদের তীব্রতাকে হ্রাস করে। রাষ্ট্রে সকল ধর্মের সমান অধিকার থাকায় এবং রাষ্ট্রনীতি সর্বতোভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ায় ধর্মের বিভিন্নতাজনিত সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু মানসিকতার সৃষ্টি হতে পারে না এবং সন্দেহ ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়। ফলে ধর্মীয় বিদ্বেষ রাষ্ট্রীয় সংহতিকে বিঘ্নিত করতে পারে না।

কোনও একটি ধর্ম রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে অংশ গ্রহণ না করায় ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বজায় রাখার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসকে প্রতারিত করে কোনও রাষ্ট্রীয় শক্তি ক্ষমতাসীন হয়ে থাকতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্র ও ধর্মের স্বাতন্ত্র্য ধর্মের অপব্যবহার রোধ করে। ফলে ধর্ম-নায়কদের পক্ষে ধর্মের প্রচার ও বিশ্লেষণ সহজতর হয়। ছোট ছোট ধর্মগুলো নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতন এবং রাজনৈতিক অনিরাপত্তার হাত থেকে রক্ষা পায় এবং ধর্ম-কর্ম সম্পাদনে স্বাধীনতা ও নিরাপদ অধিকার লাভ করে। ধর্মনায়ক যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে না, সেজন্য রাষ্ট্র ধর্মনায়কের কার্যকলাপ ও গতিবিধিকে সন্দেহের চোখে দেখে না এবং ধর্মনায়ক তার মতবাদ ও আদর্শ প্রচারের সুযোগ পায়। অপর-পক্ষে, ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে যথেষ্ট অবকাশ পায়।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করা কিন্তু সহজ নয়। যে সব রাষ্ট্র এই স্বাতন্ত্র্যকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারাও ধর্মীয় মূল্য-বোধকে রাষ্ট্রীয় আইন-ব্যবস্থা থেকে একেবারে ছেঁটে ফেলতে পারেনি। পরিবার, বিবাহ, সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্র ধর্মীয় বিধান অস্বীকার করে না। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচার মাধ্যমগুলোতে, যেমন, বেতার ও টেলিভিশনে ধর্মকে একেবারে বাদ দেওয়া হয় না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর সামনে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা একটি বড় সমস্যারূপে দেখা দেয়। শিক্ষাপদ্ধতি থেকে ধর্মকে সর্বতোভাবে নির্বাসিত করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে কি-না, সে সম্পর্কে একটা সমস্যা দেখা দেয়। তবে প্রায় সকল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেই বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে এবং পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। কাজেই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সকল সময় ধর্ম সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নয়।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য বিঘোষিত নীতি হলেও প্রয়োজন বোধে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আশ্রয় গ্রহণ

করে থাকে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট বারংবার মাকিন জনগণের ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এবং নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য রাজনীতিবিদরা প্রায়শঃই নিজ নিজ ধর্মাবলম্বীদের কাছে আবেদন জানিয়ে থাকেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও ধর্ম রাজনৈতিক নির্বাচনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে নির্বাচনী এলাকার জনগণের ধর্মবিশ্বাসকে অবহেলা করেন না।

অধুনা কোনও কোনও রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে ধর্ম ও রাষ্ট্রের সহযোগিতার কথা বলা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রে যদি সকল ধর্মই সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে এবং কোনও একটি ধর্ম যদি রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি না পায়, তাহলে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সহযোগিতা হতে বাধা কি? বরং এই সহযোগিতার ফলে উভয়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা দূর হয় এবং উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের সংহতি ও কল্যাণের সহায়ক হয়।

একথা সত্য যে, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সহযোগিতার ফলে কিছু কিছু সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু তা হতে হলে দু'টি শর্ত পূর্ণ হতে হবে। প্রথমতঃ, সকল ধর্মেরই মূল্যবোধ এক হতে হবে। তা' যদি না হয়, তা'হলে রাষ্ট্রের সঙ্গে সকল ধর্মের সহযোগিতা সম্ভব নয়। ধর্ম যদি ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ নিয়ে রাষ্ট্রের সম্মুখে হাজির হয়, তা'হলে কোনও একটি ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সহযোগিতা হতে পারে, সবার সঙ্গে সহযোগিতা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মনায়কদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের লোভ পরিহার করতে হবে। ধর্মনায়ক যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়, তা'হলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে।

দশম অধ্যায়

মার্কসবাদ ও ধর্ম

ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে হলে সমগ্র মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। এই ক্ষুদ্র পরিসরে কার্লমার্কসের দর্শন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিমত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে মোটামুটিভাবে ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী নির্দেশ করা যেতে পারে।

কার্লমার্কসের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্। মার্কস ধর্ম সম্পর্কে এঙ্গেলসের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' ও অন্যান্য রচনায় তিনি এঙ্গেলসের ব্যাখ্যা সমর্থন করেছেন।

এঙ্গেলসের মতে, যে সব বহির্শক্তি দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, মানুষের মনে তার উদ্ভট প্রতিফলনই ধর্ম এবং এই প্রতিফলনে পার্থিব শক্তি অতিপ্রাকৃত শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে। আদিম মানুষ সর্বতোভাবে প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতিকে সে বশ করতে পারেনি এবং তার দৈনন্দিন জীবন প্রকৃতির খেয়াল-খুশীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ফলে আদিম মানুষ প্রকৃতির শক্তিগুলোতে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ও মহিমা আরোপ করে এবং প্রাকৃতিক শক্তি-গুলো দেবতা, প্রেতাত্মা, ভূত-প্রেত প্রভৃতি প্রতিমূর্তির রূপ নেয়। এইসব প্রতিমূর্তি অসন্তুষ্ট হলে, মানুষের ক্ষতিসাধন করে এবং সন্তুষ্ট হলে, মানুষের উপকার করে। আদিম মানুষ তাই এইসব প্রতিমূর্তিকে খুশী করার প্রয়োজন বোধ করে। ফলে উপাসনা ও অন্যান্য আচার-পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। কালক্রমে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর পাশাপাশি সামাজিক শক্তিগুলোও প্রবল হয়ে ওঠে। সামাজিক শক্তিগুলো প্রাকৃতিক

শক্তির মতই অচেনা ও বাইরের শক্তিরূপে মানুষের সামনে প্রতিভাত হয় এবং প্রাকৃতিক শক্তির মতই, সামাজিক শক্তিগুলোর মোকাবেলায় মানুষ অসহায় ও নিরূপায় বোধ করে। ফলে প্রকৃতির রহস্যময় শক্তি এবং সামাজিক শক্তি উভয়ই উদ্ভট অতিপ্রাকৃত প্রতিমূর্তিগুলো অর্থাৎ দেবতা, ভূত-প্রেত, প্রেতাত্মাগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং প্রতি-মূর্তিগুলো সামাজিক ও প্রাকৃতিক শক্তির আধার হয়ে পড়ে। সময়ের বিবর্তনে এই ক্ষমতা অসংখ্য দেবতা, ভূত-প্রেত ও প্রেতাত্মার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে না থেকে একটি ঈশ্বরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় এবং একেশ্বর-বাদ দেখা দেয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের উপর অচেনা ও বাইরের সামাজিক ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অসহায় অনুভূতি থেকেই, মানুষের মনে ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। যতদিন মানুষ এইসব বাইরের শক্তির অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকবে, ততদিন ধর্ম বেঁচে থাকবে।

এঙ্গেল্স বলেন, বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর একাধিপত্য বজায় থাকে। ফলে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা ধর্মের অস্তিত্বের অনুকূল।

বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায়, মানুষের নিজের সৃষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং মানুষের নিজের উৎপন্ন উৎপাদনের উপকরণগুলো, এক একটি অচেনা ও বাইরের শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়ে মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে। বুর্জোয়া অর্থনীতিসংকট এড়াতে পারে না; পুঁজিপতিকে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না; আবার শ্রমিককে বেকারীত্ব ও চরম নিঃস্বতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা দিতে পারে না। মানুষ বুর্জোয়া অর্থনীতি নিজেই সৃষ্টি করেছে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোও মানুষই উৎপন্ন করেছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এগুলো যেন এক একটি অচেনা এবং বাইরের শক্তি এবং এরা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার উপর আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে।

জ্ঞানের পরিধি যতই প্রসারিত হোক, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর প্রভুত্ব রোধ করা সম্ভব নয়। শুধু মাত্র জ্ঞানের সাহায্যে সামাজিক

প্রভু শক্তিগুলোকে বসে আনা যাবে না। প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তি-গুলোকে বসে আনতে হলে প্রয়োজন সামাজিক ক্রিয়া। এই সামাজিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য হবে উৎপাদনের সকল উপকরণ সমাজের পরিপূর্ণ আয়ত্তে আনয়ন এবং তাদের সুপরিকল্পিত ব্যবহার। এই উদ্দেশ্য যদি অর্জিত হয়, অর্থাৎ সমাজ যদি উৎপাদনের সকল উপকরণ নিজের আয়ত্তে এনে সুপরিকল্পিতভাবে সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারে, তা'হলে সমাজ ও সমাজের সকল সদস্য নিজের সৃষ্টি উৎপাদনের উপকরণের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে॥ তখন সামাজিক ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলো মানুষের উপর আধিপত্য করতে পারবে না, বরং মানুষের বশীভূত হয়ে পড়বে। ধর্ম যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রভু-শক্তির প্রতিফলন, সে শক্তির প্রভুত্ব লোপ পাওয়ায় ধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন হবে। ফলে ধর্ম লোপ পাবে।

মার্কস বলেন, "ধর্ম জনগণকে তন্দ্রাবিষ্ট করে রাখে"। ধর্ম মানুষের সৃষ্টি; বস্তুতঃ সমাজ বা রাষ্ট্রই ধর্মকে সৃষ্টি করে। আদিম সমাজ প্রাকৃতিক বিরুদ্ধ শক্তিগুলোকে বসে আনতে পারেনি। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে সংগ্রামে অকৃতকার্য হয়ে, আদিম সমাজ ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং ভূত-প্রেত, দেবতা, ঈশ্বর প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, কিছুটা নিরাপদ বোধ করতে চেয়েছে।

বিবদমান শ্রেণী সমাজে একইভাবে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। শ্রেণী সমাজে শোষিত শ্রেণী ক্ষমতাশালী শোষক শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে পেরে ওঠেনি। শোষিত মেহনতী শ্রেণী নিপীড়িত হয়েছে, কিন্তু শোষক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতকার্য হতে পারেনি। সামাজিক নিপীড়ন রদ করতে না পেরে, শোষিত শ্রেণী ধর্মের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে এবং পার্থিব দুর্দশার পুরস্কারস্বরূপ পরলোকে অনন্ত সুখের আশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করে, পার্থিব নিপীড়নের তীব্রতা সহ্য করবার মনোবল লাভ করতে চেয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম একটা অলীক সুখের মোহজাল বিস্তার করে, জনগণকে বাস্তব সুখের অন্বেষণ থেকে বিরত রাখে।

মার্কস বলেন, ধর্ম শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই ধর্ম শ্রেণী সমাজের অর্থনৈতিক ভিতকে দৃঢ়তর এবং শোষণ ব্যবস্থাকে জোরালো করতে সহায়তা করে।

ধর্ম অতীতে ক্রীতদাস প্রথাকে গ্রহণ করেছে, মধ্যযুগে সামন্তপ্রথার গুণগান করেছে এবং আধুনিক সমাজে মেহনতী শ্রেণীর শোষণকে সমর্থন করেছে। যুগ যুগ ধরে ধর্ম ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা ঘোষণা করে এসেছে।

ধর্ম শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামকে মহাপাপ বলে চিহ্নিত করেছে, আবার শোষিতের উপর শোষকের নিপীড়নকে শোষিতের অতীত পাপের সাজা বলে জাহির করেছে। বস্তুতঃ ধর্ম শোষিতের জন্য ভীরুতা, অধীনতা ও হীনমন্যতাকে সদগুণ বলে নির্ধারিত করেছে। ধর্ম শোষিতকে বলেছে, ভাগ্যকে মেনে নাও, অন্যায় ও হিংস্রতার প্রতিবাদ করো না। এ ভাবে ধর্ম জনগণের বৈপ্লবিক প্রেরণাকে স্তব্ধ করেছে এবং জনগণকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে ঈশ্বরের কৃপার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে। ঈশ্বরের রাজ্য এবং পরলোকে অনন্ত সুখের চিত্তাকর্ষক গল্পের অবতারণা করে মেহনতী শ্রেণীকে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে নিরস্ত করেছে।

ধর্ম যে শ্রেণী সমাজের কাঠামোর অংশ, সেই শ্রেণী সমাজ ধ্বংস-প্রাপ্ত হলে ধর্মও ধ্বংস হবে। শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং উৎপাদনের সকল উপকরণ রাষ্ট্র তথা মেহনতী শ্রেণীর করায়ত্ত হলে ধর্মের আর প্রয়োজন থাকবে না।

—•—